উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে মহাত্মা গান্ধী (১৯২০-১৯৪৮)

GIFT

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের
এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য গবেষক বিমল চন্দ্র দাস কর্তৃক
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ডিসেম্বর-২০০২

401320

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
401320

গবেষকঃ বিমল চন্দ্র দাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রেজি-৫৩৯, সেশন ৯৬-৯৭
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

M. Phil

401320

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

"ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম
সবকো সদমতি দে ভগবান"

401320

I am a Hindu
I am a Muslim
I am a Christian
I am a Buddhist
I am a Jain
I am a Sikh
I am a Parsi

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যায়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যায়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম. ফিল গবেষক বিমল চন্দ্র দাস কর্তৃক সম্পন্নকৃত ***"উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে মহাত্মা গান্ধী" (১৯২০-১৯৪৮)*** শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত শিরোনামে আমাদের দেশে তেমন কোন উল্লেখ যোগ্য গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য অভিসন্দর্ভটি চূড়ান্ত দাখিল করার পূর্বে আমি গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ন পাঠ করেছি। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ অভিসন্দর্ভ অথবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি। অভিসন্দর্ভটির জন্য গবেষককে এম. ফিল ডিগ্রী প্রদানের জন্য সুপারিশ করছি।

401320

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া)
অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
২১শে ডিসেম্বর, ২০০২ইং।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি বিমল চন্দ্র দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম ফিল গবেষক এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***"উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে মহাত্মা গান্ধী" (১৯২০-১৯৪৮)*** শিরোনামের এম. ফিল অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূইয়া মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে আমি নিজে সম্পন্ন করেছি। এটি আমার একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম এবং এর কোন অধ্যায় অন্য কোন পত্রিকা বা পুস্তকে কখনো প্রকাশ করিনি। আরো প্রকাশ থাকে যে, এ অভিসন্দর্ভ অথবা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয়নি।

(বিমল চন্দ্র দাস)

বিমল চন্দ্র দাস

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

রেজিঃ নং-৫৩৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখঃ

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,

২১শে ডিসেম্বর, ২০০২ইং।

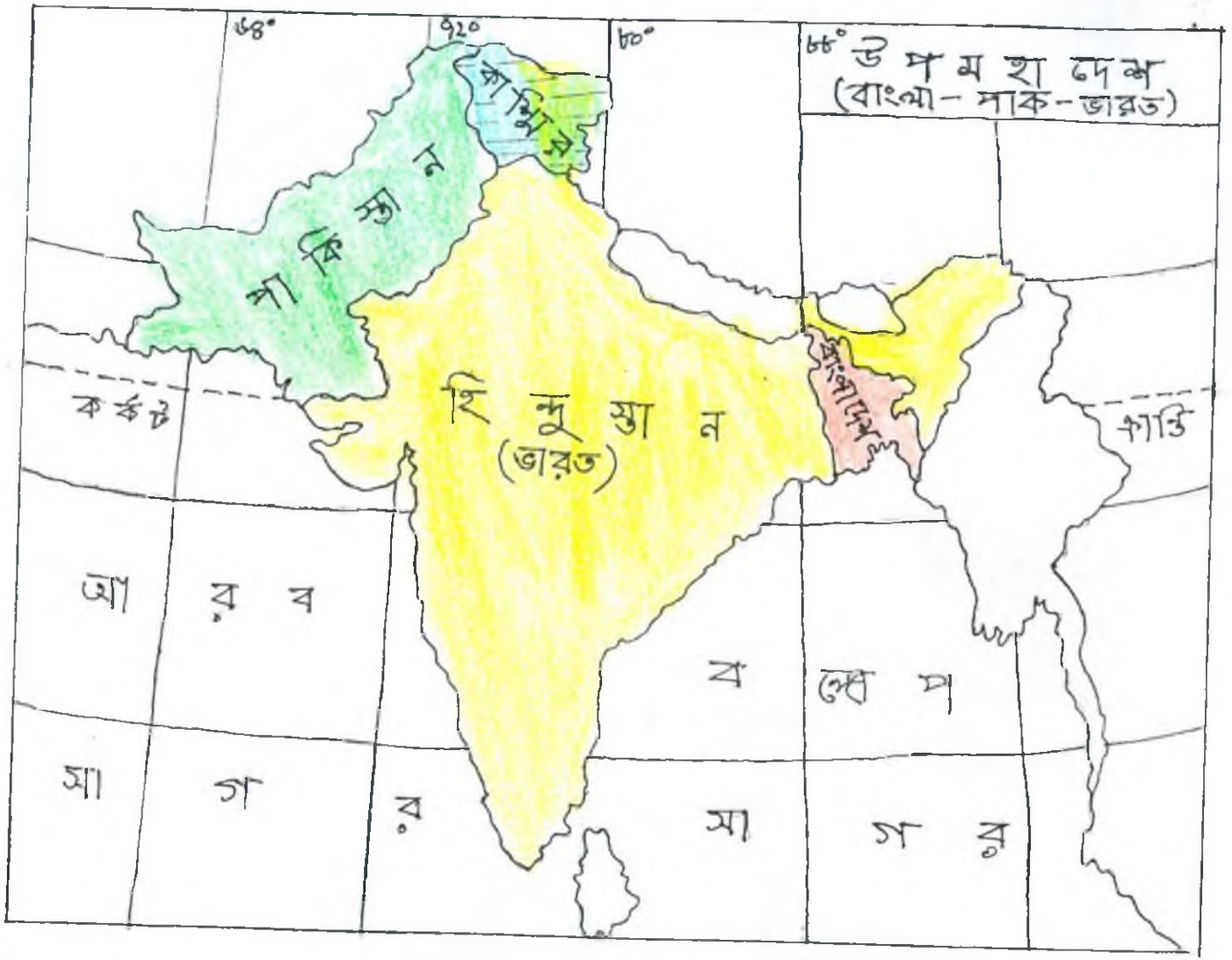

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

ঃ সূচীপত্র ঃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়ঃ ১-৯
সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ১০-৩২
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুফল

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ৩৩-৪৫
রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানঃ

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ৪৬-৬১
গান্ধী চিন্তা ও নীতি

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ৬২-৮৯
অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ ও মহাত্মা গান্ধী

উপসংহারঃ ৯০-৯৪

পরিশিষ্টঃ

পরিশিষ্ট-১	সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা	
পরিশিষ্ট-২	দৈনন্দিন জীবনযাত্রা	
পরিশিষ্ট-৩	ভাষণ	৫টি
পরিশিষ্ট-৪	পত্রাবলী ও তারবার্তা	৭টি
পরিশিষ্ট-৫	স্বাক্ষাৎকার	২টি
পরিশিষ্ট-৬	যুক্ত ইস্তেহার	১টি
পরিশিষ্ট-৭	আলোক চিত্র	৩টি

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীঃ ১-৮

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুধু রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা নয় সাম্প্রদায়িকতার পুরো বিষয়টিই আমাকে সবসময় বিশেষ ভাবে পীড়া দেয়। উপমহাদেশের এ স্পর্শকাতর সংকটটির কথা চিন্তা করেই যাঁরা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে পরিশ্রম করেছেন তাদের কাজ সম্পর্কে গবেষণা করতে আগ্রহী হই। এ লক্ষ্যে আমি ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের অবদান তুলে ধরার প্রয়াস পাই এ গবেষণা কর্মে। অহিংসা, সত্যবাদিতা, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী উপমহাদেশের একমাত্র ব্যক্তিত্ব।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আজ ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে বর্ণ, জাতি, দলীয় ও আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটিও দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ করে অশান্ত ও ভয়াবহ করে তুলেছে। যেমন ভারতের উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের হিন্দু, আসামী-বাঙালী, পাকিস্তানের শিয়া-সুন্নী-মোহাজেরদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সভ্য মানব সমাজের জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করে চলেছে। এ সাম্প্রদায়িকতাই আজ উপমহাদেশের সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ক্রীড়ানক হিসাবে কাজ করছে। মহাত্মা গান্ধী ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় হিংসার বদলে যোগ করেন সম্প্রীতি। শুধু এ উপমহাদেশেই নয়, সারা বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তায় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রণয়ন করেন এক অব্যর্থ কৌশল-অসাম্প্রদায়িক চেতনা-যার বদৌলতে মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব কলহের মধ্যেও গড়ে তোলা যায় ঐক্য ও শান্তির পরিবেশ। সমস্যা সঙ্কুল বিশ্বে গান্ধীজীর এ রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি স্থাপনে কি আঞ্চলিক, কি আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতম উপায় হিসেবে অধুনা নতুন করে বিবেচিত হচ্ছে। এ গবেষণায় উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর অবদান উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমে প্রণাম জানাই পরম করুণাময় স্রষ্টাকে যাঁর করুণা ছাড়া এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়ার তত্ত্বাবধানে ও সার্বিক সহযোগিতায় আমি আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তিনি আমার এ গবেষণা কর্মের প্রতিটি অধ্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করে এবং প্রয়োজনীয় 'ইন-পুট' প্রদান করে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন যা নিঃসন্দেহে গবেষণার মানকে উন্নত করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে বলে আমি মনে করি; আর এ জন্য আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

তথ্যের জন্য নিজস্ব সংগ্রহের অনেক প্রয়োজনীয় পুস্তক সরবরাহ করে শ্রী পরিমল মালাকার আমাকে সবিশেষ সাহায্য করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি সেকশনের জনাব মোঃ শাহজাহান সরকারকে আমি সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বোন লক্ষ্মী দাস ও ভাই অমল চন্দ্র দাস এর বিভিন্ন পর্যায়ের আর্থিক সহযোগিতায় গবেষণা কর্মটি বাস্তবায়ন সহজ হয়েছে বলে তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও মুদ্রণের বিষয়ে ম্যাক্রো কম্পিউটারের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ আবু ডানিয়েল, সহকারী সুমল ও সুমন এর সহযোগিতা অনস্বীকার্য। আমার পিতা মাতা ছাড়াও কাকা বাবু শ্রী অনিল চন্দ্র দাস মহাশয়ের অনুপ্রেরণা আমাকে এ গবেষণা কাজটিকে দ্রুত সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছে। উপমহাদেশের সমসাময়িক রাজনীতিতে দলীয় ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ আগ্রাসনের সংকটময় মুহূর্তে গবেষণা কর্মটি রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তারিখঃ
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ,
২১শে ডিসেম্বর, ২০০২ইং।

বিমল চন্দ্র দাস
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপক্রমণিকা

গবেষণা প্রকল্পের সূচনাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান নিয়ে এশিয়া মহাদেশের যে অঞ্চল গঠিত সেটাই উপমহাদেশ হিসাবে আখ্যায়িত হয়। পূর্বে এ পুরো অঞ্চল 'ভারতবর্ষ' নামে পরিচিতি ছিল। বিষ্ণু পুরাণের শ্লোকে এ অঞ্চল সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্
বর্ষং তদ ভারতং নাম
ভারতী যত্রসন্ততিঃ॥

অর্থাৎ সমুদ্রেব উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে যে দেশ অবস্থিত তার নাম ভারত; ভারতের সন্ততিগণ সেখানকার অধিবাসী।[১] এ উপমহাদেশ তথা বাংলা-পাক-ভারতের রাজনীতিতে বর্তমানে অন্যতম একটি সংকট হচেছ "সাম্প্রদায়িকতা"। কালের আবর্তে এতদঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষা, গণতান্ত্রিক চেতনা আধুনিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি এখনও মাঝে মাঝে ফণা তোলে ছোবল দেয়।

উপমহাদেশে ক্ষীণ ধর্মীয় বিরোধের অস্তিত্ব ইংরেজ শাসনের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, তবে তা রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিল না। বিশেষ করে এর প্রকাশ ৭১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মুসলিম আক্রমণ, রাজ্য জয় ও আধিপত্য বিস্তারের প্রাক্কালেই। যেহেতু ভারতে মুসলমান আক্রমণকারীরা তাদের প্রবেশের মাধ্যমে রাজ্য দখল ছাড়াও ধর্মবিস্তারের বিষয়টিকে অগ্রগণ্য হিসাবে উপস্থাপনে সচেষ্ঠ ছিল। এমনিভাবে ধর্মগত পার্থক্যে পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ জয় পরাজয় কলহের মাধ্যমেও উপমহাদেশে ধর্মীয় বিরোধের মানসিকতা কমবেশী তৈরী হয়। অন্য দিকে ইংরেজরা খ্রীস্টান হলেও ভারতে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে ও পরে ব্যাপক কলেবরে খ্রীস্টান ধর্মীয় প্রথা, নীতি ও কৃষ্টিকে মুসলমানদের মত ব্যপকভাবে সরাসরি উপস্থাপনে সচেষ্ট হননি। যে কারণে ইংজেদের সাথে এ অঞ্চলের মানুষ বিশেষ করে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সাথে ধর্মীয় বৈপরীত্য জনিত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিষয়টি মনে তেমন প্রবল ভাবে তৈরী হয়নি।

ইউরোপে "জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State)" ধারণার গোড়াপত্তনের পরপরই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র জাতীয় চেতনাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে একই ভূখন্ডের ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐ সংশ্লিষ্ট ভূখন্ড বেষ্টিত রাষ্ট্রের মধ্যে একতাবদ্ধ করে একটি সার্বজনীন পরিচয়ের একক জাতি

[১] নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ও সুনীল ভট্টাচার্য, *ইতিহাসের হাজারো ঘটনা, ভারতবর্ষ*, পৃ-১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বিশ্বে নিজেদের মেলে ধরবার প্রয়াস চালায়। সাম্রাজ্যবাদের অবসান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এ মতাদর্শটি তাবৎ বিশ্বে ব্যপকভাবে প্রসারিত ও গৃহীত হয়। এটি মানুষের গোত্র ধর্ম বর্ণ গত বাধাকে কমিয়ে সকলকে এই স্রোতে মিলে বিকশিত হওয়ার পথ সুগম করে দেয়।

এ সময় ভারতবর্ষে ও ইউপরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এক নতুন শ্রেনীর সৃষ্টি হয় যা 'ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ'। তারা আত্মসচেতন, স্বদেশ ও নিজস্বতার চিন্তার এক নতুন গোষ্ঠী। এই শ্রেণীই পরবর্তীতে একতাবদ্ধ হয়ে জাতীয় চেতনাকে বেগবান করে এবং তৈরী করে প্রথম উপমহাদেশীয় স্বার্থের সংগঠন 'কংগ্রেস'। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যনার্জির নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এর উদ্যোগে কলকাতার জাতীয় সম্মেলনের প্রেক্ষিতে ও অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্ভেন্ট অক্টোভিয়ান হিউম এর সহযোগিতার ফসলই ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বের তেজপাল কলেজের হল ঘরে বাঙালী বুদ্ধিজীবি উমেশ চন্দ্র ব্যনার্জির সভাপতিত্বে এ সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। কংগ্রেস জন্মের পর এর মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলামান-শিখ-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানধর্ম নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরী হতে থাকে 'স্বদেশ মুক্তির চেতনা' যা পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। এ প্রসঙ্গে রজনী কোঠারী লেখেন-" First the congress grew more critical of the failure of the Government to respond to the gestures of friendship and co-operation that its leaders had been making. These also emerged within the Congress alongside the moderate leadership led by Gokhale, a powerful group of militants led by Bala Gangadhor Tilak, Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal. This group emphasized political struggle and the building of a strong nation wide movement."[২]

ইংরেজ শাসনামলে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে ও বৃটিশ রাজত্বের ভীত ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন ইংরেজ শাসকরা বাংলা-পাক-ভারত তথা উপমহাদেশের প্রধান দু'টি ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যের অনুভূতিপ্রবণ স্পর্শকাতর বিষয় গুলোর মাধ্যমে ও অত্যন্ত সুকৌশলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্ধ তৈরী করে সাম্প্রদায়িকতাকে সাবলীল ঋষ্টপুষ্ট করে তোলে। নিজেদেব ক্ষমতা বজায় রাখার লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধ শক্তির ঐক্যেকে টুকরা করার জন্যই ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক বিভক্তির জঘন্য কৌশল অবলম্বন করে। এর ফলে সচল হয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা স্বাধীনতা লাভের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলিত শক্তি মত্ত হয় স্বাধীনতার পরিবর্তে নিজেদেব ক্ষমতা দখল ও স্বার্থ উদ্ধারে। ইংরেজ শাসনের শেষদিকের সময় গুলোতে সাম্প্রদায়িকতা পুরো উপমহাদেশে তথা বাংলা-পাক-ভারতে ব্যপক ভয়াবহতা তৈরী করে। এর ফলে অকালে ঝরে পরে অনেক তাজা প্রাণ। মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনের স্থান দখল করে সন্দেহ। সংঘাত ও হানাহানীর কারণে স্বজন,স্বদেশ ও ভিটামাটি হারিয়ে মানুষ হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ়। ইংরেজরা তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী নিশ্চিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে কৌশলে এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানদের মনে বপন করে যায়; যা দেশীয় কিছু রাজনৈতিক নেতা, আমলা ও স্বার্থান্বেষী লোকের মাধ্যমে স্ব স্ব ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আরো ব্যপকতা লাভ করে। গড়ে উঠে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল 'মুসলীম লীগ'। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে ঘটে সাম্প্রদায়িকতার ফসল ভয়াবহ নরহত্যা নামের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

সাম্প্রদায়িকতার ফলে মানুষ হয়ে যায় মানুষের কাছে বিষাক্ত সাপ কিংবা মানুষ খেকো বাঘ। সন্ত্রাসী এবং মাস্তানদের রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার ও নেতা সাজার গোড়াপত্তন উপমহাদেশের এ ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গুলোর সময়ই। সে মাস্তানী তথা সন্ত্রাসের মাত্রাই আজ দলীয় ক্ষমতার যোগ্যতা বিবেচিত হয় নেতা নেত্রীর কাছে। বাংলা-পাক-ভারতের রাজনীতির নেতার যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে সকল রাজনৈতিক দলে যা আজ সমাদৃত হয়ে আসছে সগৌরবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে সংঘাত, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংখ্যালঘু নিধনসহ ইত্যকার মানবতা বিরোধী জঘন্যতম নানা ঘটনা আজ নিত্য দিনের সঙ্গী। গণতন্ত্র আজ দলীয় সাম্প্রদায়িকতার কালিমা লিপ্ত।

'প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সেই রাষ্ট্রের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণের সব কিছুতে সমানাধিকার লাভ ও লাভের সুযোগ থাকা একটি কল্যাণ মূলক ও সুশীল সমাজ সম্পৃক্ত মানব গোষ্ঠীর পূর্ব পরিচয়। কিন্তু অধুনা রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ হয়ে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল করছে গণতন্ত্রের আদলে এবং তৈরী করছে সাম্প্রদায়িক বিষ যা যে কোন রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের আত্মঘাতি অস্ত্র।'

রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও হিংসার সম্পৃক্ততাকে বিলুপ্ত করতেই মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী নিজেকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করেন। তিনি প্রবর্তন করেন অহিংস, অসাম্প্রদায়িক মানবতার রাজনীতি। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহারকে চিরকালই তিনি ঘৃণা করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে করেছেন সংগ্রাম। একারণেই তিনি আখ্যায়িত হয়েছেন- One of the great activist theoreticians of the twentieth century.[৩]। চিরকাল অহিংস অসাম্প্রদায়িক গান্ধীজীর মানবসেবার রাজনীতির যাত্রা সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে তিনি নির্যাতিত বিজাতি কালো মানুষের পক্ষে ও অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। নিজে নির্যাতিত হয়েছেন মানবতার টানে। পরবর্তীতে নিজ জন্মভূমি উপমহাদেশের বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষার মানুষকে মিলিত করে একটি শান্তিপূর্ণ মানব গোষ্ঠী তৈরী করার তাগিদেই ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে কাজ শুরু করেন।

তিনি ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছেন মানুষের কল্যাণ এবং রাজনীতির উৎকর্ষতার জন্য; যা অন্য কোন তাত্ত্বিক পারেনি। গান্ধীজী বলেছেন যে ধর্ম ছাড়া রাজনীতি প্রাণহীন। তিনি সকল ধর্মের বিশ্বাসকে জনগণকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছেন। আর রাজনীতি তার কাছে 'মানব সেবার ব্রত'। যেহেতু ধর্ম মানুষের কল্যাণ করে অতএব রাজনীতি মানব সেবার ব্রত হিসাবে এর কাজও মানুষের কল্যাণ।

---

[২] Rajani Kothari, Politics in India, p-70

[৩] Subrata Mukherjee and Sushila Ram Swamy, *Facts of Mahatma Gandhi,Political Ideas-2, p. xv*

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তার মত ব্যবসায়িক রাজনীতি তিনি প্রশ্রয় দেননি। স্বধর্ম কিংবা বিধর্মের স্বার্থে বা বিপক্ষে নয়। যখনই সম্প্রদায়িকতার আগুন মানুষকে গ্রাস করেছে তখনই তিনি যেখানে ঝাঁপিয়ে পরেছেন অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বাণী নিয়ে।

রাজনীতিতে আজকাল ক্ষমতা দখল ও স্বার্থোদ্ধারের খেলাই প্রবল; সেটা যে কোন মূল্যে হোক। সংবিধানে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম', 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম', 'রামমন্দির বাবরী মসজিদ ইস্যু', 'সংখ্যালঘু নিধনের জেহাদ', 'মসজিদে উলুধ্বনি', 'ইসলামী লেবাসসহ' যে কোন মূল্যে ক্ষমতাই এখন দলীয় রাজনীতির সাফল্যের সোপান। ধিক্ এ রাজনীতিকে ধিক্ এর নেতৃত্বকে। যে রাজনীতি মানুষ মানুষে হানাহানি বাড়ায়; লুট, ধর্ষণ আর মানুষের রক্তে ডুবিয়ে দেয় মানবতা, ধর্মের লেবাসে করে গণহত্যা, গণতন্ত্রের নামে করে সংখ্যালঘু নির্যাতন সে রাজনীতি মানুষের জন্য দরকার নেই। গান্ধীজী রাজনীতির এ কলংক ঘুচাতেই প্রবর্তন করেছিলেন মানবতার রাজনীতি, অহিংসার রাজনীতি, সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি শুধু তত্ত্ব উপস্থাপন করে ক্ষান্ত হননি। বাস্তবে নিজে কাজ করেছেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে। নিজের জীবন দিয়ে মানুষকে জানিয়ে গেছেন তার মানবতার রাজনীতির কথা। মানুষের ধর্মের কথা ও কল্যাণের কথা। শুধু বক্তৃতা ও তত্ত্ব নয় নিজে সক্রিয় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বাহক ছিলেন। এ জন্য বলা হতো- Gandhi was a political actionist and a practical philosopher, he was not a theorist.[8] গান্ধীজী অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মানবতার জন্য এমন আত্মবলিদানের উপমা বিশ্বে দ্বিতীয়টি মেলেনা।

সম্প্রতি বিশ্ব রাজনীতির সংকট ও মানবতার অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে এ কথা এক বাক্যে বলা যায়- 'অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া শুধু উপমহাদেশে নয় তাবৎ বিশ্বের কোথায়ও শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়'। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশই পারে বিশ্ব শান্তির কার্যকর ও ফলপ্রসূ গ্যারান্টি দিতে। মহাত্মা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তা আজ বিশ্ব রাজনীতিতে, মানব কল্যাণের ক্ষেত্র নানাবিধ সমস্যা সমাধানে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। গতানুগতিক রাজনৈতিক কার্যকারিতার অপারগতাকে ঘুচিয়ে রাষ্ট্র চিন্তায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা। অতএব অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও অহিংসার মন্ত্রে বিশ্ববাসীকে দীক্ষিত করা আজ সকল নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনাঃ

রোঁমা রোঁলা লিখিত ও ঋষি দাস অনুবাদকৃত 'মহাত্মা গান্ধী' শিরোনামে ১৯৪৮-সালে ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলিকাতা, থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখা যায় . . . এখানে মহাত্মা গান্ধীর

---

[8] Subrata Mukherjee and Sushila Ram Swamy, *Facts of Mahatma Gandhi,Political Ideas-2*, p. xv

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম থেকে শুরু করে শিক্ষা জীবন, রাজনৈতিক চিন্তা ও ভারতীয় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ও অসাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে গান্ধীজীর দৃঢ় মনোভাবের কথা বিবৃত হয়েছে কিন্তু গান্ধী চিন্তার উৎস, অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাস্তবায়নে গান্ধীজীর কর্মতৎপরতার উল্লেখ নেই।

লুইস ফিশার (Louis Fischer) লিখিত 'The Life of Mahatma Gandhi' শিরোনামে ১৯৫০সালে Harper & Brothers Publishers, New York থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে গান্ধীজীর ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ, তাঁর ধ্যানের ভারত, বিশ্বনেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী, লেখকের সাথে অবস্থান ও সাক্ষাৎকার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকালীন সময়ে উপমহাদেশের দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে ভ্রমণের ঘটনা, বিশ্বরাজনৈতিক চিন্তা, অনশন ও জীবনাবসান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা, গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক চেতনার উৎস, বিশ্বপরিস্থিতে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ধর্ম চিন্তা বিষয়ে নির্দিষ্ট ভাবে বিস্তারিত কোন আলোচনা নেই।

গান্ধীজীর প্রিয় সহকর্মী ও শিষ্য মাওলানা আবুল কালাম (Maulana Abul Kalam Azad) রচিত, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি অনুবাদকৃত 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'(India Wins Freedom) শিরোনামে ১৯৮৯ সালে, স্বপ্নীল প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে দেখা যায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ও গান্ধীর প্রতি তাঁর মনোভাব, গান্ধীজীর বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্টতা, বৃটিশদের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনা, স্বাধীনতা আন্দোলন, গান্ধীজীর আমরণ অনশন, দেশ বিভাগ কালীন গান্ধীজীর বিভিন্ন পদক্ষেপ, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি বিষয়ে গান্ধীজীর দৃঢ় মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকলেও সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, উপমহাদেশে রাজনৈতিক সংঘাত নিবসন ও শান্তি স্থাপনে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে সুনির্দিষ্ট কোন আলোচনা নেই। উক্ত গ্রন্থ সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় আমার উত্থাপিত শিরোনামে ব্যপক কাজ হয়নি। অতএব এ প্রেক্ষিতে আমার গবেষণা কর্মটি গুরুত্ব বহন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

আমার এ গবেষণা কর্মের নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সমূহ বিদ্যমান-

প্রথমত, ধর্মীয় অস্মিতা ও ক্ষমতা দখলের বানিজ্যিক রাজনীতি উপমহাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রে আজ বড় সমস্যা। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো গান্ধীজীর চিন্তায় সকল ধর্মে শ্রদ্ধা ও মানব ধর্মের প্রাধান্য এবং রাজনীতি যে মানব সেবার ব্রত এ বিষয়ে সকলকে উজ্জীবিত করে দলীয়, সম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় হানাহানী এবং সংঘাত বন্ধের স্থায়ী সমাধান করা।

দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে উদারনৈতিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম বাধা। এ গবেষণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক থাবা প্রসার রোধের এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বৃদ্ধির নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটানো।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, সাম্প্রদায়িকতার ফলে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায়ই যে ধর্মান্ধতা, দাঙ্গা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তা সভ্য মানব সমাজের জন্য কলংক জনক এবং উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পরিপন্থী । সাম্প্রদায়িকতার এ কুফল সর্ম্পকে জনগণকে জ্ঞাত ও সচেতন করে তোলা এ গবেষণা কর্মের অপর একটি উদ্দেশ্য।

চতুর্থত, আমার গবেষণার আর একটি উদ্দেশ্য হলো- এ গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে, মহাত্মা গান্ধীর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরীক্ষে উপস্থাপন করা। এতে করে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও চিন্তায় অসাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি বেগবান হবে।

পঞ্চমত, সাম্প্রদায়িকতার কারণে সুষ্ঠ প্রগতিশীল সেকুলার রাজনীতিতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়; এ গবেষণার ফলে মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্র চিন্তার আলোকে সে সমস্যা সমাধানের কৌশল উদ্ভাবনের রূপরেখা তৈরী করা যাবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহঃ

আমি আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে ঐতিহাসিক-তুলনা মূলক-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ থেকে উপাদান, উদ্ধৃতি, তথ্যাদি ও বিষয়াদি সংগ্রহ করেছি। প্রাসঙ্গিক পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। সংগৃহীত এসব তথ্যকে অধিকতর উন্নত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আমি মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত পত্রালাপ, ভাষণ ও স্বলিখিত প্রবন্ধ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রয়াস পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতাঃ

" Communalism " শব্দটি "Commune" শব্দ থেকে এসেছে এর অর্থ হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র নগর/জেলা/বিভাগ যেখানে একজন মেয়র সহ স্বায়ত্ব শাসন বর্তমান। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস কমিউন ছিল জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সে সময় থেকেই "কমিউনালিজম" শব্দটি বিশেষ অর্থ দোত্যক হয়ে উঠে ও কলংক চিহ্ন অর্জন করে।[১] "এ হলো এমন এক বিশ্বাস যে, একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়। যার অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় যারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত। এই বিশ্বাস অনুযায়ী তারা শুধু (একই ধর্মের অনুবর্তীরা) ধর্মীয় স্বার্থের অংশীদার নন বরং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ অভিন্ন।"[২]

ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার একটি উৎস কিন্তু ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সমার্থক নয়। সাম্প্রদায়িকতা একটি মনোভঙ্গি (Orientation) অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি। এটি এমন একটি চেতনা যা সম্প্রদায়গত। বদরুদ্দীন উমর উল্লেখ করেন "ধর্মের আচার বিচার এবং তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে তাকে আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পৃথক বিষয়। কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতি সাধনে প্রস্তুত থাকে। এখানে ক্ষতি সাধনের মানসিক প্রস্তুতি অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ শত্রুতা পরিচয় বা বিরূপতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষ এ ক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য হলো সম্প্রদায়।"

ধর্ম নিষ্ঠার সাথে যোগ হচ্ছে ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার বিচারের কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যক্তির আচরণ ও ধর্ম বিশ্বাসের গুরুত্ব বেশী। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে নিজের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ এক জাতীয় আনুগত্যের গুরুত্ব বেশী। "এছাড়া সত্যকার ধর্মনিষ্ঠা পরকাল মুখী। পরকালেই তার সত্যকার পুরস্কারের আশা। সাম্প্রদায়িকতার মুনাফা ইহলোক। ধর্মনিষ্ঠার জন্য অন্যের বিরুদ্ধাচরণের প্রয়োজন নেই। অন্যের বিরুদ্ধাচরণও ক্ষতি সাধনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ও পরিণতি। ধর্মের সাথে তাই

[১] সুজিত সেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও উত্তোরণ, পৃ-২৫
[২] বিপান চন্দ্র আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ, পৃ-১

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার আচরণকে ভিত্তি করে যে সমাজ ও সম্প্রদায় গঠিত হয় সেই সম্প্রদায়ের ঐহিক স্বার্থই সাম্প্রদায়িকতার জনক।[৩]

সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্র ইহজাগতিকতা কিন্তু বহিরাবরণ ধর্মীয়। 'আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ইহজাগতিক দাবী সমূহ নিছক কোন ধর্ম মতে বিশ্বাসী হবার জন্য যখন সেই ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থাপন করতে থাকে তখনই তা সাম্প্রদায়িকতার মূল বিন্দু হয়ে উঠে। ইহজাগতিক দাবী সমূহ এক্ষেত্রে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ভাষায় উপস্থাপন করা হয়।'[৪] সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে প্রবোধ কুমার তাঁর উল্লেখ করেন, "...Communalism means to believe or propagate that the socio-economic and political interests of one religions, caste or an ascriptive group are dissmilar and antagonistic: to those of another. .....communalism is an ideology, It is not a total ideology and it is not an ideology of a particular class. Communalism is distorted ideology as it reflects objective reality not adequately but in a distorted way.....[৫]

সাম্প্রদায়িকতা কোন শ্রেণীর মতাদর্শ নয় এটিকে সমাজতাত্ত্বিক বলে বিপান চন্দ্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবেঃ "Communalism was not, like antiimperialism or class consciousness based on a real conflict on a distorted reflection of real conflict on a distorted reflection of real conflict or 'replacement' of real conflict. Nor was there any objective basis for ... the myth of the solidarity of all members of a religions community on the myth of the existence of a religions-based community.[৬]

সাম্প্রদায়িকতা হচেছ বিকৃত ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পৃক্ত এক চেতনা। তিরিশের দশকে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সাম্প্রদায়িকতাকে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ধর্মীয় আবরণে মোড়া ইহজাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির বিকৃত চেতনা সম্পৃক্ত মনবতা বিরোধী ঘৃণ্য মানসিক মতাদর্শ নামের যে সাম্প্রদায়িকতা তা বর্তমান বাংলা-পাক-ভারত তথা উপমহাদেশের এক সামাজিক ক্যান্সার। ধর্মের সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতার উৎস তবে সমাজের শাসক শ্রেণীরাই ধর্মকে নিজ স্বার্থে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িকতাকে চিরঞ্জীব করে তোলে।

মতাদর্শ হিসাবে সাম্প্রদায়িকতা হলো বর্তমান উপমহাদেশের শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শের একটি দিক; যার পৃষ্ঠপটে রয়েছে ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত সামন্ত উপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং এই কাঠামোর উপর গড়ে উঠা এক বিকৃত "পুঁজিবাদী ব্যবস্থা"।

---

[৩] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃ-১১

[৪] Asgar Ali Engineer. Communalism and communal Violence in India, P-189-90

[৫] Pramod Kumar . Communal Ideology its Basis, Dimension and social Appeal; Teaching poilites, p-179

[৬] Bipan Chandra, Communalism in Modern India, p-23

Dhaka University Institutional Repository

আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, "The roots of sectarian violence in India lie, boardly speaking, in the conjunction of two systemic forces: Uneven capitalist development and competitive politics."[7]

অসাম্প্রদায়িকতাঃ

বিশেষ কোন দল বা ধর্ম সম্প্রদায় সর্ম্পকে বিচার, অধিকার, সুযোগ, মুল্যায়ণ, স্বার্থ ইত্যকার বিষয়ে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল পর্যায়ে নিরপেক্ষতাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতা। এটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার ঠিক উল্টো। সাম্প্রদায়িকতার আতুরঘর ধর্মের সংকীর্ণতায় হলে ও অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মের সূচী শুভ্র পবিত্র প্রকাশ যেখানে ধর্ম বিশ্বমানবতাকে করে রাখী বন্ধনে আবদ্ধ। পরলৌকিক স্বার্থের আনন্দে ইহলোককে করে আনন্দময়, বন্ধুময়, যেখানে থাকে না হিংসা বিভেদ অবিচার। ন্যায়, অহিংসা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মানুষের মানবতা প্রস্ফুটিত হয়। এ প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতাকে বলা যায় ধর্মের জারজ সন্তান। অসাম্প্রদায়িকতা যে কোন মানব গোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক রাষ্ট্রিক ইহজাগতিক, পারলৌকিক সকল ক্ষেত্রে কল্যাণ চিন্তার প্রতীক। তাই অধুনা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িকতা অপরিহার্য।

অসাম্প্রদায়িকতা কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মের নিরীক্ষে ইহজাগতিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক স্বার্থকে উদ্ধার করার মানসিক চেতনাকে কখনও স্বীকার করেনা। এখানে সম্প্রদায়কে প্রাধান্য না দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সাম্প্রদায়িকতায় ধর্মের বিকৃত করা হয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে। অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়কে নূন্যতম সৌজন্যবোধ প্রদান করা হয় না। মানুষকে নিরপেক্ষভাবে তার গুন ও কর্মের এবং যোগ্যতার প্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িকতা বিচার ও মূল্যায়ণ করতে নারাজ। অথচ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কর্ম, গুন ও যোগ্যতার প্রেক্ষিতেই অসাম্প্রদায়িকতা মানুষকে মূল্যায়ণ করে, ধর্ম কিংবা গোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্বে নয়।

অনেক মতাদর্শের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা যেখানে সার্বজনীন স্বার্থের মতাদর্শকে পাথেয় করে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শকে একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে কার্যকর করে অন্যান্য সম্প্রদায় তথা মতাদর্শকে করে পদদলিত। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নেই। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনাই এরূপ রাষ্ট্রের লক্ষ্য; সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক।

অসাম্প্রদায়িকতা এমন এক চেতনা ও আদর্শ মত যেখানে আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের স্বার্থকে নিরপেক্ষভাবে ন্যায়তা দক্ষতা, যোগ্যতা ও সার্বজনীনতার প্রেক্ষিতে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৭]

---

[7] Asgar Ali Engineer, The making of riot narrative, Seminar, November,2002 Vol-519, Delhi.

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিঃ

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক এরিষ্টটল 'রাজনীতি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, "উৎকৃষ্ট জীবন লাভের জন্য কোন সমাজের সংগ্রামের নামই রাজনীতি।" একটি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার মতামত, নিয়মনীতি ইত্যকার বিষয়াবলী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আধুনিক কালে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের ধারনায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সামগ্রিক কল্যাণ বিধানই রাজনীতির মূল কেন্দ্র বিন্দু। অন্য পক্ষে রাষ্ট্রনীতিতে যখন ধর্মীয় অস্মিতার প্রেক্ষিতে বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি প্রকট হয় বা হতে চেষ্ট করে কিংবা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল সমূহে বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থোদ্ধারে রাজনৈতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয় বা সাফল্যলাভ করে, ভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তারা সাম্প্রদায়গত কারণে হয় শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত; এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তথা রাজনৈতিক চরিত্রই সম্প্রদায়িক রাজনীতি।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে গুন, যোগ্যতা, দক্ষতা, ন্যায়তা, নীতি বড় কথা নয়। রাষ্ট্রের চরিত্র কার্যাবলী, নীতি, মনোভঙ্গি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মগত একরূপতার কারণে (নিরপেক্ষ জাতীয় সংস্কৃতি বর্জিত) ঐ ধর্মের সম্প্রদায়ের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই সর্বদা কর্মক্ষম থাকে যেকোন উপায়ে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে মানবতা তুচ্ছ, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতমায়ন, প্রাধান্য, ব্যপকতা, প্রসারতা, স্বার্থলাভ আসলকথা। ভিন্ন ধর্মীয় মতের সম্প্রদায়ের মানবিক বৈধ আবেদন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অস্তিত্বহীন। সম্প্রম্প্রদায়িক রাজনীতি ও তার সন্তর্পনে এগিয়ে চলা বর্তমানে সুস্থ কল্যাণমূলক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনুষত্ব ও মানবতা বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরীর ক্ষেত্রে বড় বাধা। শুধু বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব নয় একই রাষ্ট্রের ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংহতির মাধ্যমে কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র গঠনে ও জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উন্নত জীবন রচনায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এক বিভীষিকা। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, গোত্র, বর্ণ বৈচিত্রের উন্নয়নকামী রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির করাল থাবা আরও ভয়ংকর।

গোড়া পত্তনঃ

ইংরেজ পূর্ব যুগে ভারত বর্ষে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমূহই ছিল উপমহাদেশের সমাজ ও আর্থিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। অন্ন বস্ত্র এবং জীবনেব যাবতীয় আয়োজনের দিক থেকে গ্রাম বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের বিশেষ কোন নির্ভরতা ছিলনা। "এই আত্মনির্ভরশীলতাই ভারতীয় জীবন যাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইংরেজদের পূর্বে অন্যান্য দেশীয় এবং বৈদেশিক রাজচক্রবর্ত্তীদের সাথে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল রাজস্ব লেনদেনের। রাজা এবং রাজ বংশের পতন উত্থানের অর্থ তাদের কাছে তাই ছিল রাজস্ব-গ্রহীতার পরিবর্তন মাত্র।"[৮]

[৮] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃ-১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের পুরানো দিনের ইতিহাস রাজায় রাজায় লড়াই মূলতঃ সাম্রাজ্য বিজয় ও রক্ষার ইতিহাস। এটা হিন্দু বনাম মুসলমান বা মুসলমান বনাম শিখ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লড়াই নয়। কারণ "মহামতি আকবরের সেনাপতি হিন্দু মানসিংহ, হিন্দু রাজা রানাসঙ্গের দুই সেনাপতি হাসন খাঁ ও আওরঙ্গজেব ও হিন্দু অভ্যুত্থানের নায়ক শিবাজীর ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একাধিক বিধর্মী সেনাপতি দিল। ১৩৯৩-১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে ৩৫ জন সুলতানের ১৯ জন নিহত হয় হিন্দুদের হাতে নয় মুসলমান প্রতিদ্বন্দীর হাতে। তুর্কী, পাঠান, মুঘল এদেশে হত্যা লুণ্ঠন করে প্রধানতঃ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। শুধুমাত্র একতরফা ইসলামী জেহাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়।"[৯]

উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তার ব্যবধান অনেক। সূফী মতবাদ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সেতু বন্ধন রচনায় এগিয়ে এলেও এ দুটি সম্প্রদায়রের মধ্যে সামাজিক পর্যায়ে যে পরিমান লেনদেন হওয়ার কথা তা কোন দিনই হয়নি। সামাজিক লেনদেন এবং পরস্পরিক বোঝাপড়া ও বিবেচনা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার সৌহার্দ্য, প্রীতি এবং মিলন সংস্থাপনের অন্যতম উপায়। এ বিষয়টি সন্তোষ জনক ভাবে উম্মুক্ত না থাকায় শত বছর ধরে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি থাকা সত্বেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কাংখিত পর্যায়ে স্বাভাবিক হয়নি।

বদরুদ্দীন উমর লিখেন, "হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যের একটা অস্বাস্থ্যকর চেতনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজদের আর্বিভাবের পূর্বেই বর্তমান ছিল তবে তা গোড়াতে জনসাধারণের ক্ষেত্রে সক্রিয় বিরোধে পরিনত হয়নি। ভারতীয় জীবন যাত্রার আত্মনির্ভরশীলতার যে বৈশিষ্ট্য তার মাহাত্ম্যেই রাজা সম্রাজ্যের উত্থান পতনকে অগ্রাহ্য করে প্রাচীন জীবন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে নিজেকে অব্যাহত রেখেছিল।"[১০] রজনী কুঠারীর কথায়, "In spite of differeing philosophies of religion, the Islamic doctrine of "brotherhood of all men" and the Hindu doctrine of "different roads to the same truth "had been subtly drawn together into an amorphous idea of mutual tolerance and generosity that was peculiarly and characteristically Indian."[১১] শুধুমাত্র এ বিষয়টি ভারতীয় জীবন যাত্রায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তার লাভের সুযোগ করে দেয়নি।

ইংরেজদের আগমনের ফলে বৃহত্তর ভারতীয় জীবন ক্ষেত্রে যে গতি ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল তার ফলে অনেক পুরাতন সমস্যা নিশ্চিহ্ন হলো। ইংরেজ পূর্ব রাজরাজেশ্বরেরা ভারতের বৃহত্তর জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয় জীবনযাত্রায় ধনতন্ত্রের বীজ বপন করে তার আর্থ সামাজিক জীবনের ভিত্তির অমূল পরিবর্তন করেছিল। এভাবেই তারা শ্রম বিভাগকে জন্ম নির্ভরতার পরিবর্তে করল জন্ম নিরপেক্ষ।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে জীবন যাত্রার যে নতুন আয়োজন করল তাতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে কিন্তু সমানভাবে এগিয়ে এলো না। নতুন সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি

---

[৯] নৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত ইতিহাস, পৃ-২৮
[১০] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা,পৃ-১২

Dhaka University Institutional Repository

আগের তুলনায় খর্ব হলো অনেক খানি। ইংরেজরাও তাদের পূর্ববর্তী হিসাবে পুরাতন হিন্দু এবং বিশেষ করে মুসলমান আমীর ওমরাহ্ এবং রাজন্যবর্গকে সুনজরে দেখলনা। উপর তলার মুসলমান সমাজে তাই দেখদিল ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ। সে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অংশ মোঘল এবং মুসলমান সাম্রাজ্যের পতনকে তাদের নিজেদের পতন বলে গণ্য করে নিজেদেরকে করল এক ঘরে। অন্য দিকে ভারতের অমুসলমান জনসাধারণ জীবনের যোগাযোগ এবং চলাচলের এ নতুন আয়োজনে যোগ দিল বিপুল উৎসাহে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকে নিজেদের পতন বলে ভুল করার কারণ তাদের ছিলনা। উপরন্তু সে পতনের মধ্যেই তারা দেখল নিজেদের উত্থানের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এ নির্দেশ শিরোধার্য করে তারা অবতীর্ণ হলো নতুন জীবন সংগ্রামে। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী, শিক্ষা-দীক্ষা এবং জীবনের বিভিন্ন ও বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে এক শতাব্দী ধরে করল প্রতিষ্ঠিত।[১২]

সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে উপমহাদশের জনগণের মনে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। কে. আলী লিখেন, "১৮৫৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'টাইমস্' পত্রিকায় নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে চর্বি মাখানোর সংবাদে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের প্রেক্ষিতে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তা ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ প্রথমে বঙ্গদেশের ব্যারাকপুরে; পরে মীরাট, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য ভারতের প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবে রূপ নেয়। বিদ্রোহীগণ এ সময় দিল্লী অধিকার করিয়া সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্কে সম্রাট বলে ঘোষণা করে।[১৩] এ বিদ্রোহের অবসানের পর কোম্পানীর রাজত্বের আবসান ঘটে এবং ১৮৫৮ সনে মহারাণীর ঘোষণা পত্রের মাধ্যমে ভারত প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। এ সময় ভারতের গভর্ণর ভাইসরয় রাজপ্রতিনিধি উপাধি লাভ করে। ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি হয় এবং সচিবকে সাহায্য করার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হয়।

কে .আলী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "আন্দোলনে ব্যর্থ হবার পর মুসলমানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশের দমন নীতি প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ চলেছিল।"[১৪] ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর সেকালের এক বাঘা প্রশাসক 'লর্ড ক্যানিং' উল্লেখ করেন- 'তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের প্রধান দুই উপাদান 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' যদি কোন উপায়ে মিলিত হতে পারে তবে ব্রিটিশদের অবস্থা শোচণীয় হবে এবং সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে।'

পরবর্তীতে রয়াল কমিশনের সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লর্ড এফেনষ্টোন স্বাক্ষ্য দেন যে, "হিন্দু মুসলমানদের মিলিত সৈন্য বাহিনীর কারণে সিপাহী বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছিল। কমিশন তাই ভারতবাসীর মধ্যে 'ভেদভাব বীজ' বপনের সুপরিকল্পিত সুপারিশ করল।"[১৫] এর প্রথমেই চোট পরল

---

[১১] Rajani Kothari, Politics in India, p-62
[১২] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃ-১৩
[১৩] অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (আধুনিক ও মধ্য যুগ), পৃ-১২৫
[১৪] অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (আধুনিক ও মধ্য যুগ), পৃ-১২৫
[১৫] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীর উপর সৈনিকদের মধ্যে ধর্ম ও জাতভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হলো। সৃষ্টি হলো রাজপুত, শিখ, মাহার, জাঠ ও আহির রেজিমেন্ট।

সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে এলো এগিয়ে চলার তাগিদ। এই সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে অনুভূত হলো ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার প্রয়োজন; ইংরেজরা ও পিছিয়ে না থেকে সহযোগিতার আয়োজনে এগিয়ে আসল। দেখা গেল সাধারণ ভাবে দেশের মধ্যে যারা অগ্রসর তারা হল হিন্দু এবং মুসলমানরা হলো সাধারণ ভাবে পশ্চাদপদ। ভারতবর্ষে শ্রেণী বিভাগের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে এই ভাবে দেখা দিল সাম্প্রদায়িক বিভাগ। অন্যান্য দেশের মত তাই ভারত ও জাতীয় আন্দোলন মোটামোটি মধ্য বিত্ত কেন্দ্রিক হলেও সে মধ্যবিত্ত বিভক্ত হলো দুই সম্প্রদায়ে। একটি হিন্দু অন্যটি মুসলমান।

আধুনিক হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থানের মুহূর্তে অন্য কারো সাথে তার কোন রেষারেষি ছিল না। ইংরেজ ছিল তার বহু উর্ধ্বে। মুসলমান তার থেকে ছিল অনেক পশ্চাতে। প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাদের প্রগতি তাই থাকল অব্যহত; কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটল না। ইংরেজদের সাথে সহযোগীতার মাধ্যমে মুসলামান মধ্যবিত্তের উত্থান পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকল হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা। শুরু হলো তাদের প্রতিযোগিতার পালা। এ প্রতিযোগিতা বিভিন্ন কারণে হিন্দু মুসলমানের আর্থিক জীবনের মধ্যে নিয়ে এলো বিরোধ সংঘর্ষ এবং রেষারেষি। আর্থিক জীবনের এ বিরোধই ব্যাপ্তি লাভ করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করল ঘোরতর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বিরোধ।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি সম্পর্কীত এক সেমিনারে উল্লেখ করা হয়, "ধর্মকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের একক (Unit) করার প্রথার মূল উৎস উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস। ইংরেজরাই কেবল ভারতের সমাজকে ধর্ম অবধারিত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা করতেন না ভারত তত্ত্ববিদ্ পন্ডিতদের রচনাবলীতেও এর নিদর্শন মেলে।"[১৬] তবে সেটা রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার রঙে জনসাধারণের মধ্যে ব্যপ্ত ছিলনা। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হিন্দু মুসলমানের এ স্বার্থগত সংঘর্ষকে ইংরেজরা উপেক্ষা করল না। বরং নিজেদের সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এ বিভেদকে স্বীকৃতি দিয়ে অনেক কৌশলে এককে অন্যের বিরুদ্ধে তারা স্থাপন করল। এর প্রমাণ মেলে আলোচ্য বক্তব্যে "১৮৬২ সনে ভরত সচিব 'উড' যিনি বড়লাট লর্ড এলগিনকে লেখেন, "ভারতে আমরা ক্ষমতা বজায় রেখেছি এক দলকে অন্যদলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে এবং এ কাজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং সবার ভিতর সম্মিলিত চেতনা জাগার আগে জাগার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যা পারেন করুন।"[১৭]

জাতিরাষ্ট্র (Nation state) ধারণার গোড়াপত্তনের দিকে তাকালে দেখা যাবে

'নেশন স্টেট' ভিত্তিক জাতি ভাবনার জন্ম ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে। রোমান চার্চের বিরুদ্ধে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও নানা পতন অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে সেই ভূখন্ডের বিকাশ ঘটে।

---

[১৬] The Politics of Religious Communities Seminar, January, 1990, p-28

[১৭] *শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়*, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানী ও ইটালীতে নেশনস্টেট গড়ে উঠার পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। ইউরোপের এ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে এ দেশে প্রবর্তিত হতে শুরু করে।"[১৮] পরবর্তীতে"রাজা রাম মোহনের সময় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে হিউম্যানিজমের প্রভাবে ফরাসী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য মানব মুখী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সম্মুখে এসে বিদ্বান সমাজের এক ধরনের বিপ্লব প্রিয়তা দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের মত ভারতবর্ষেও ঘটুক এমন কল্পনা হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র মনে করতেন।"[১৯] ভারতবর্ষের নবগঠিত উচচ ও মধ্যবিত্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার ভারতীয় জনতার মধ্যে উন্মেষ ঘটে জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও চেতনার। তারা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে তাদের চেতনাকে প্রাথমিকভাবে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সনের ২৮শে ডিসেম্বর বাঙালী বুদ্ধিজীবি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মহালগ্ন সূচীত হয়।[২০]

কংগ্রেস একটি সম্প্রদায় নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি যখন হিন্দু মুসলমানের মিলিত অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তার পথে অগ্রসরমান তখনই ইংরেজ শাসনের বিভেদ নীতির কুটচাল সচল হলো।

"স্যার সৈয়দ আহম্মেদ ও লর্ড ডফেরিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'হিন্দু মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি'[২১] ডফেরিন মুসলমানদের আলাদা একটি সম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে নিজেদের মনে করতে উৎসাহিত করলেন। অথচ "কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা হলো- প্রশাসনের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখিয়ে দিয়ে তার উন্নতির উপায় সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি মডারেট দল হিসাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগ ও আয়োজন হিউম করেন এই লর্ড ডফেরিনের পরামর্শ মত।[২২]

ইংরেজদের ভেদনীতির কূটচালে ফসল হিসেবে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করেন। এর ফলে হিন্দু মুসলমানের রেষারেষির চূড়ান্ত গোড়াপত্তন ঘটে। বঙ্গভঙ্গ রদ করার লক্ষ্যে হিন্দুদের পরিচালিত আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্যই এসময় স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সূচনা ঘটে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলমান প্রতিনিধি দল নতুন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবী জানালে লর্ড মিন্টো এ দাবী মেনে নেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় এক অধিবেশনে নবাব ভিকার-উল-মুলক এর সভাপতিত্বে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল "নিখিল ভারত মুসলীম লীগ" জন্মলাভ করে। এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রথম গোড়াপত্তন ঘটে। পরবর্তীতে 'মর্লিমিন্টো সংস্কার' বা '১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের'

---

[১৮] *Sorbo Polli Gopal*, British Policy in India: 1868:1905, p-158
[১৯] নাজমা জেসমিন চৌধুরী, বাংলা উপন্যাস ওরাজনীতি, পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, পৃ-১৫
[২০] মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ সমাজ ওরাজনীতি, পৃ-২৮(৪র্থ অধ্যায়)
[২১] মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ সমাজ ওরাজনীতি, পৃ-২৮(৬ষ্ঠ অধ্যায়)
[২২] Dr. Seta Ramaiya, The history of the Congress (1st part), p-22-24

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ভারতে প্রচলিত হল সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন। সাম্প্রদায়িকতা ভারতীয় রাজনীতিতে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। এভাবে ভারত উপমহাদেশে গোড়াপত্তন ঘটল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির।

এ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে আরো বেগবান করা প্রসঙ্গে রজনী কোঠারী তাঁর গ্রন্থে লেখেন- "The volt-face in India's commercial politics came in 1928 when Jinnah returned to India a changed man. He accepted the communal approach he had fought so long, and presented the league with a radical fourteen-point program which apart from communal representation and schemes of weight age and Muslim veto on certain kinds of legislation, asked for declaration of certain provinces as Muslim majority area for all time to come.... "[২৩] মুসলমানদের দাবী ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী 'Communal Award'ঘোষণার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে চূড়ান্ত করে।

"ভূতপূর্ব ভারত সচিব অলিভার লন্ডন টাইমস্ পত্রিকায় এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, "ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন মুসলিম সম্প্রদায়কে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উল্টো পাল্লার ওজন হিসাবে ব্যবহার করার নীতি নিয়েছে।"[২৪] ১৯৪৬ সালের কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার পর বৃটিশদের মনোভাব সম্পর্কে সুচিতা মহাজন উল্লেখ করেন, " In mind 1946 the viceroy advanced the suggestion that in the event of failure to reach and agreement retreat to the provinces that would constitute Pakistan should be preferred to the options of repression or complete withdrawal. The premise was that the Muslims would welcome the British presence as being in mutual interest. The viceroy was among those who believed that the British must continue to support the Muslims, who has been their best friend over the years. " [২৫] যার ফলে সম্প্রদায় ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে তৈরী হয় দু'টি রাষ্ট্র 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান'। যেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হতে থাকে। অতএব বলা যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিভেদনীতির কূটচালের পরিণতিতে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোড়াপত্তন ঘটে।

---

[২৩] Rajani Kothari, Politics in India, p-68

[২৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-১৩০

[২৫] Sucheta Mahajan, Independence and partition, p-149.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কুফল

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের শাসনকে স্থায়ী করার জন্য উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মীয় ভেদভাবকে প্রথমে সামাজিকীকরণ করে। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ ও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় হিংসাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করে, যা উপমহাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণকে ভংয়কর আঘাতে পঙ্গু করে দেয়। অবশ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অগ্রযাত্রায় উপমহাদেশের স্বার্থান্বেষী নেতৃত্বের সহযোগিতাকেও একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই; বরং এদের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ রাজত্বকালেই উপমহাদেশে ধনতন্ত্রের সূত্রপাত এবং তার সম্প্রসারণের ফলে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিল তার স্বরুপকে উপলব্ধি এবং আয়ত্ত করার সুযোগ ভারতীয়রা পেলনা। "এ দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক, শ্রমিক, নর-নারী, মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক শ্রেণী স্বার্থের তাড়নায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের বৃহত্তর স্বার্থকে সম্পূর্নভাবে উপেক্ষা করে উন্মত্ত হলো পারস্পরিক দ্বন্ধ কলহে।"[১] এ ধর্মীয় দ্বন্ধ কলহের পরিণতি সাম্প্রদায়িকতা ও সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফসলই ভারত উপমহাদেশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ব্যপকতার মধ্যে দিয়ে তৈরী হলো কতগুলো হীননিয়ামক যা রাষ্ট্রের সুষ্ঠ রাজনৈতিক উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ, গণতন্ত্রের বিকাশ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নাগরিক কল্যাণ সর্বোপরি শান্তি ও মানবতাকে করল হুমকীর সম্মুখীন। এ গুলো থেকে উত্তোরণের মধ্য দিয়ে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অগ্রযাত্রার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী।

---

[১] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা,পৃ-৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মানুষে মানুষে বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রধান অস্ত্র। এ প্রসঙ্গে সুজিত কুমার সেন লিখেন,'ভিন্ন কোন ধর্ম, ভাষা বা জাতির (Caste+Ethnic) দুই-ই মানুষের কোন সদস্যের অনত্র তাদের কোন ধর্ম, ভাষা অথবা জাতির মানুষের প্রতি কথিত বা কল্পিত কোন অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেবার মানসিকতা চালিত আক্রোশ থেকে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ এবং এমন কি আত্মরক্ষার অসমর্থ নারী ও শিশু হত্যা ইত্যাদির নাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ব্যক্তিগত ভাবে কোন দুস্কৃতিকারীকে বাধা দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া থেকে এর মানসিকতা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে এক দেশের রাম রহিমের সত্য অসত্য অপরাধের জন্য অন্য দেশের শ্যামল রহমানকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিযুক্ত যেহেতু ধর্ম, ভাষা ও জাতি একরূপ যদিও তারা অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানেনা।'[২]

দাঙ্গার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে 'সিয়ারুল মোতা আখেরীন'-এ বিখ্যাত হিসাবে চিহ্নিত দু'টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উল্লেখ আছে। একটি আহমেদাবাদে হোলি উৎসবের সময় অন্যটি কাশ্মীরে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসনামলে (কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে) ও ১৭০০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে কিছু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়। ক্রিস্টোফার বেলাই এগুলোর উল্লেখ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িক কলহের যে উল্লেখ বাংলা-পাক-ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় এগুলোকে পুরাপুরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না বলে বরং প্রতিবেশীর কলহ বিবাদ বলে ধরা যায় । তবে উপমহাদেশের ইংরেজ শাসন দৃঢ়মূল হবার পর এবং এতদঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্মেষে জাতীয়চেতনা গঠনের প্রাককালে; ব্রিটিশরা এ জাতীয় ঐক্যের চেতনাকে বিনষ্ট করার জন্য 'ভেদনীতি'র কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম গ্রন্থে লিখেন, '১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন এই বাংলা প্রদেশটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার বিশ্বাস ছিল যে এ বিভক্তি হিন্দুদের দুর্বল করে দেবে এবং বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করবে একস্থায়ী বিভেদের।'[৩] হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে লর্ড কার্জনের আশা পূর্ণ হয়ে ছিল।

পরবর্তীতে ১৯০৯ ও ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ইংরেজরা উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার যোগসূত্র স্থাপন তথা বীজ বপন করে। এর ফলেই প্রাচীন কালের তুলনায় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার মদদে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ন্যক্কার জনক পৌনঃপুনিকতা এসময় ভয়াভহ আকার ধারণ করে। বঙ্গভঙ্গের সময়কার দাঙ্গার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তার প্রধান দুই উপাদান হিন্দু এবং

---

[২] সুজিত কুমার সেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও উত্তরণ, পৃ-১৬
[৩] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-৪

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চীর ধরে। এসময় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রার্দুভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে বীভৎস রূপ নেয়। উল্লেখ যে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের যুগে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী দূষিত হয় যা পূর্বে দেখা যায়নি।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে সর্ব প্রথম বঙ্গভঙ্গের মাধ্যম সামপ্রদায়িক রাজনীতির উৎপাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কলেবরে নিজেকে উন্মোচিত করে। এ সময় অনেক ছোটবড় দাঙ্গা হয়। '১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে জামাল পুরে একটি মেলায় বিলেতী পণ্য বিক্রয়কে কেন্দ্র করে এক ভয়াভহ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সুএপাত ঘটে। রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে কুমিল্লার সংঘঠিত দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন।'[৪]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'রাউলাট আইন' বিরোধী গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত কানপুর, পশ্চিম বাংলার বড় বাজার, হাওড়া, মেটেবুরুজ অঞ্চলে ব্যপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নজির পাওয়া যায়। 'ইন্ডিয়ান স্টেটুটরি কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শ্রীযুক্ত পাণ্ডে তাঁর লেখায় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যা, ফৈজাবাদ, ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আগ্রা, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সাহাবাদ ও ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সারানপুর জেলার কাতার পুরে দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেন। কাতার পুরের দাঙ্গায় ৩০জন মুসলমান নিহত ৬০জন আহত এবং গ্রামের সব মুসলমানদের বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়।'[৫]

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের 'রাউলাট আইন বিরোধী আন্দোলন' এবং 'খিলাফত আন্দোলন' এর সময় কোন দাঙ্গার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়না। তুরস্কে গাজী কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক তুর্কী ক্ষমতা লাভের পর এ খিলাফত আন্দোলনের অবসানের পর পরই সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাসে উপমহাদেশ জর্জরিত হয়ে পড়ে। সাল অনুযায়ী শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দাঙ্গার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

-১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ১লা আগষ্ট হতে কেরলের মালবার অঞ্চলে মোপলদের সাথে যে দাঙ্গা হয় তা প্রায় ৬ মাস ধরে চলে। এতে ৬০০ হিন্দু নিহত, ২৫০০ জন ধর্মান্তরিত, ২৩২৯ মোপল নিহত ও ১৬৫২ জন আহত হয়।[৬]

- **১৯২৩** খ্রীস্টাব্দে ১১ই এপ্রিল অমৃতসরে গুরুতর দাঙ্গা হয়। মূলতানে ১৬ এবং ২৮শে এপ্রিল, অতপর পাঞ্জাবে। ২৪শে আগষ্ট সাহারানপুরে গুরুতর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। ২৬শে সেপ্টেম্বর বদায়ুঁ এর নিকটস্থ আল্লাপুরে গুরুতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৭ই অক্টোবর ঝাঁসিতে দাঙ্গা। ২৯শে অক্টোবর

---

[৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-২৯
[৫] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-২৮
[৬] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পিলিভত এর নিকটবর্তী বিশালপুরে গুরুতর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ঘটে। ১৯শে ও ২১শে নভেম্বর নাগপুরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে।[৭]

-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম দাঙ্গার খবর আসে ২৬শে জুন দিল্লীর জামা মসজিদের পিছনের এলাকা থেকে। ১১ই জুলাই দিল্লীতে ঘটে গুরুতর দাঙ্গা। পরবর্তী কয়েকদিন এ দাঙ্গাটি ছোট ছোট সংঘর্ষের মাধ্যমে এগিয়ে ১৫ তারিখে গুরুতর রূপ ধারণ করে। ৯ ও ১০ই সেপ্টেম্বর সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে ঘটে শোচনীয় দাঙ্গা। কোহাটের এ দাঙ্গাটির বিষাক্ত প্রভাব ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। ১২ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌতে দাঙ্গা ঘটে কোহাট দাঙ্গার প্রতিধ্বনি হিসাবে। এর এক সপ্তাহ পরে লক্ষ্ণৌ এর পশ্চিমে জেলা শহর শাহজাহাঁপুরে আবার দাঙ্গা হয় চেহলুমের দিন।[৮]

-১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে ৩রা জুলাই কলকাতায় দাঙ্গা হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে মার্চ উত্তর প্রদেশের ফতেপুর। কলকাতায় ১ হতে ১৫ এপ্রিল, ২২শে এপ্রিল হতে ৮ই মে, ১১ হতে ২৫শে জুলাই তিন দফায় ব্যপক দাঙ্গা ঘটে। এতে ৩ জন পুলিশ সহ ২১০ জন নিহত ও ৯৫ পুলিশ সহ ৯৭৫জন আহত হয়। এসময় ৮টি মন্দির, ৭টি মসজিদ, ৩টি গুরুদ্বার ও ৩টি দরগাকে ভাংচুর নচেৎ অপবিত্র করা হয়। কলকাতার এ দাঙ্গা প্রসঙ্গে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন বলেন যে, 'এর পিছনে ছিল বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের গোপন হাত যারা এই ভেদভাবকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগিয়ে ছিলেন। বাংলার দুই সদস্য হামিদ খাঁ ও ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র গুহরায় এ বক্তব্য সমর্থণ করেন।[৯]

-১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই জুন রাওয়ালাপিন্ডিতে দাঙ্গা ১১৫ জন মুসলমান, ২ জন হিন্দু, ১জন শিখ নিহত হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে ঢাকায় দাঙ্গা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে, ২২শে অক্টোবর ছাপরায় দাঙ্গা হয়।

- ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ২রা মার্চ পোনাবালিয়া, ২৯শে মার্চ সিন্ধু প্রদেশের লারকানায়, ৩রা মে সুরাতে, ৪ঠা মে দানাপুর, ৩রা জুলাই নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে ও ১১ই জুলাই মুলতানে দাঙ্গা হয়। এ দাঙ্গায় ৫ জন মুসলমান, ৬ জন হিন্দু, ১ জন শিখ নিহত হয় ও ১৭ জন আহত হয়। ২রা আগষ্ট বিহারের বেতিয়ায়, ঐ বছরের জন্মাষ্টমীতে কুমিল্লায়, ২৯শে আগষ্ট রেরিলিতে গুরুতর দাঙ্গায় বহু হতাহত হয়। ৪ ও ৫ই সেপ্টেম্বর নাগপুরের দাঙ্গায় ২০ জন নিহত ও ১০০ জন আহত হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর সোলপুরে, ১১ই সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদ, ২৮শে সেপ্টেম্বর দেরাদুনে, ১৪ই নভেম্বর দিল্লীতে দাঙ্গা হয়।[১০]

-১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে জুলাই বাঙ্গালোরে, ২৮শে সেপ্টেম্বর সুরাতে, ২৯শে অক্টোবর তামিলনাড়ুর তিরপুর জেলার কালিপলয়মে গুরুতর হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হয়।

-১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনে মৌলানা আহম্মদ আলীর মত নেতা ঘোষণা করেন, "মুসলমানদের হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতা সমাজে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

---

[৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৩৭
[৮] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪০
[৯] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪১
[১০] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪২

Dhaka University Institutional Repository

কারণ অতীতে তাদের তাবৎ ধর্মযুদ্ধে একজন মুসলমান ৩ জন কাফেরকে পরাজিত করেছে" বক্তব্যের মাধ্যমে। ফলে কালের ইতিহাসে ৫ হতে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বোম্বের দাঙ্গা অধিক গুরুতর হিসাবে চিহ্নিত যাতে ১৩৭ জন নিহত ও ৭৮৩ জন আহত হয়। ২৩শে এপ্রিল আবার বোম্বেতে দাঙ্গা হয়।

-১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী ও ২৪শে জুন কয়েক দিন ব্যাপী দুই দফায় দাঙ্গা হয়। ১৩ই জুলাই ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে ব্যপক দাঙ্গা ঘটে।[১১] ৫ই আগষ্ট সিন্ধুর শুক্কুরে দাঙ্গা হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর দাঙ্গা হয় বোম্বাই এর ধরাতি অঞ্চলে।

-১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে মার্চ কানপুরের দাঙ্গা হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক জল বিভাজিকা রেখা তুল্য। তিন দিন এ দাঙ্গা চলে। এতে মৃত্যুর সংখ্যা ৪ থেকে ৫ শত। জ্ঞানেন্দ্র পান্ডের বিবরণ অনুসারে দাঙ্গার প্রথম দিনে "কেবল রেলগাড়ীতেই ৮০ হাজার মানুষ শহর ছেলে পালিয়ে যায় বলে বলা হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান পুনরুত্থানবাদী 'সংগঠন' ও 'তাঞ্জিম' আন্দোলনও এই দাঙ্গার পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল। ১১ই ফেব্রুয়ারী বারনসীতে দাঙ্গা হয়। পরে মীর্জাপুরে ও আগ্রাতে দাঙ্গা বাধে। ৩১শে আগষ্ট ও পরের দিন চট্টগ্রামে একতরফা হিন্দু নিধন শুরু হয়।[১২]

-১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ১৪ই মে থেকে ৫ই জুলা বোম্বাই শহরে ৭ বার দাঙ্গা হয়। ১৩৯ জনের মৃত্যু ১৪০০ জন আহত হয়। একই বছর জুলাই মাসে আরো কয়েকস্থানে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১১ই অক্টোবর হরিয়ানা জেলার বুধলাতে দাঙ্গা হয় সেখানে ১১ জনের মৃত্যু ঘটে।

-১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ৫ই মে আলোয়ার রাজ্যে দাঙ্গা হয়। ৬ই এপ্রিল কলকাতার বেহালা থানার শিবপুরে দাঙ্গা বাধে। বেলাডাঙ্গার পরবর্তীতে দাঙ্গা ঘটে ৭ই জুলাই।

-১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি দাঙ্গা ঘটে। ২৮শে মার্চ কেরলের কাননানপুরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটে।[১৩]

-১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ১২ই এপ্রিল হাজারীবাগে হিন্দু মুসলমান সংঘর্ষ ঘটে এবং ১৫ই এপ্রিল উত্তর প্রদেশের ফিরোজাবাদে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটে। জুলাই মাসের ৮, ১৫, ২০, ২২, ২৩ লাহোরে পৌনঃ পুনিক দাঙ্গা হয়। ২৫শে অক্টোবর শিখ মুসলমান দাঙ্গা বাধে। ২৯শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত শিখ মুসলমান দাঙ্গায় কয়েকজন মৃত্যু বরণ করেন।[১৪]

-১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল দাঙ্গা হয় পুনার মারুতি মন্দিরকে কেন্দ্র করে। ২৭শে এপ্রিল জামালপুরে হিন্দুদের এক বিবাহকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা হয়। এরপর বেলগাঁও এর খানাপুরে জলপাই গুড়িতে দাঙ্গা। ১৫ই অক্টোবর বোম্বের বাইকুলাতে মারুতি মন্দিরের মন্ডপ তৈরীকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটে যা নিয়ন্ত্রণের জন্য শহরের সব পুলিশ মোতায়েন করেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি,

---

[১১] Sugato Bose, The riots of communual violence in Bengal-A study of Kishorgonj Riots, Modern Asian Studies, Vol-163, Juli, 1982

[১২] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪৭

[১৩] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫০

[১৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫১

Dhaka University Institutional Repository

মফঃস্বল থেকে পুলিশ আনতে হয়েছে। ৫ দিন চলমান এ দাঙ্গায় ৫৫ জনের মৃত্যু সহ ৫০০ জন আহত হয়। ১০ ও ২৯ নভেম্বর বোম্বের কানতিপরায় দাঙ্গা ঘটে।[১৫]

-১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ২৭শে মার্চ হরিয়ানার পানিপথে দাঙ্গা হয়, এতে ১৪ জনের মৃত্যু ঘটে। ১লা মে মাদ্রাজে ৫০ জন আহত হয়। ২৪শে মে সেন্ট্রাল প্রভিন্স, পাঞ্জাব ও সিন্ধুর শিকারপুরে দাঙ্গা ঘটে। ৪ঠা ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশে দাঙ্গা হয়।

-১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ নববর্ষের সূচনা নিয়ে এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। ১৭ই মার্চ থেকে একটানা কয়েক দিন এ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলে। ২৬ তারিখে হরিজন পত্রিকায় এ দাঙ্গা সম্পর্কে গান্ধী লেখেন- "কংগ্রেস সদর দপ্তর যে এলাহাবাদ শহরে, সেখানেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ; এই কথা প্রমাণ করে যে কংগ্রেস এখনও ভারতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্থলাভিষিক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি।" ১০ই এপ্রিলের সরকারী ঘোষণা মতে জানা যায় যে, নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদ শহরে দাঙ্গা হয়। ১৭ই এপ্রিল বোম্বাই ও ২৫শে এপ্রিল বিদূরস্থানম এ দাঙ্গা ঘটে। ২৮শে এপ্রিল কংগ্রেস না মুসলিমলীগের পতাকা উত্তোলিত হবে এর জন্য এলাহাবাদে সংঘর্ষ। ১লা আগষ্ট বিহার বিধান সভার মূলতবী প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ভাগলপুরে দাঙ্গা। ৪ঠা অক্টোবর সিলেট দাঙ্গা হয়।[১৬]

-১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জানুয়ারী আসানসোলে, ২৯শে জানুয়ারী গয়ায়, ১১ই ফেব্রুয়ারী কানপুরের দাঙ্গা ১৩ তারিখ পর্যন্ত চলে। ২রা, ৪ঠা মার্চ উত্তর প্রদেশ সহ বারানসী এবং কানপুরে পুনরায় দাঙ্গা। ৫ই মার্চ কোলকাতার কাশীপুরে, ৬ তারিখ নৈহাটি, টিটাগড়, খড়দা, কামারহাটি এবং মেটেবুরুজে দাঙ্গা ঘটে। ১৯শে মার্চ ঢাকায় ১৭ জন আহত। ৭ই মে গয়ায় গুরতর দাঙ্গা ১১জন মৃত্যু ৯০ এর বেশী আহত। মে এর শেষে মহারাষ্ট্রের শোলপুরে দাঙ্গা, ১৯শে জুন কানপুরে। ৪ঠা অক্টোবর নীয়াটে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। ২০শে নভেম্বর থেকে ৩রা জুন পর্যন্ত সিন্ধু প্রদেশের শুক্কুরে ও গ্রামাঞ্চলের দাঙ্গায় ২৯ জন মৃত্যু ও ২৬ জন আহত হয়।

-১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুর শুক্কুর জেলায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী দাঙ্গায় সিন্ধুর তাদানীন্তন আইন শৃংখলা মন্ত্রী গোলাম হোসেন হিদাতুল্লা দাঙ্গা পীড়িত এলাকায় ঘোষণা করেন যে, "তিনি দাঙ্গায় প্ররোচণা দানকারী 'বদমায়েশ তত্ত্বদের' নিশ্চিহ্ন করবেন নচেৎ শান্তি প্রিয় নাগরিকদের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন।" এ সময় বর্ধমান জেলার কুলাটিতে দাঙ্গা শুরু হয় এতে ৪ জন মৃত্যু ২৬ জন আহত।"[১৭]

-১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে। ১৪ই মার্চ হোলির দিনে যে দাঙ্গা শুরু হয় তা পৌনঃপুনিকভাবে চলতে থকে। ১৭, ১৮, ১৯ মার্চ তা প্রবল হয়ে ঢাকাসহ নারায়ণগঞ্জের গ্রামাঞ্চলকেও গ্রাস করে। এতে বহু লোক নিহত হয়। ২৪শে মার্চ বিধান সভা চলাকালীণ সময়ে ফজলুল হক সাহেব প্রশ্নোত্তর পর্বে উল্লেখ করেন যে, "এ পর্যন্ত ২৮ জন মৃত্যু বরণ করে ও ১৩৭ জন আহত হয়। দাঙ্গা তদন্তে ২৭শে জুন যখন তদন্ত চালায় তখন শান্তি স্থাপনে কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র

---

[১৫] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৩
[১৬] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫২
[১৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রসাদও ঐ দিন ঢাকায় আসেন তখনও দাঙ্গা ঘটছিল। এমনকি যখন মন্ত্রীরা উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করছিলেন, তখনও দাঙ্গা ভূমিকম্পের মত থেকে থেকে হচ্ছিল। এতে ১০/১৫ হাজার হিন্দু নারী-পুরুষ নিকটবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়।"[১৮]

এই বছরই ১৮ই এপ্রিল থেকে ২২শে এপ্রিল পর্যন্ত দাঙ্গা হয় আহমেদাবাদে যেখানে প্রায় ৫৫ জন মৃত্যু বরণ করে। ২৫শে এপ্রিল বোম্বে প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়ে মে এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। আবার ২২শে মে থেকে ৩রা জুন এ সময় গোরা সৈন্য নামিয়েও দাঙ্গা আয়ত্ত্বে আনা সম্ভব হয়নি। ২২শে জুন বোম্বে আবার দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। বিহার শরীফে এপ্রিলের শেষে দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং তা শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। এতে প্রথম দিনেই ২১জন মৃত্যু এবং অনেকে আহত হয়। দাঙ্গার উপশম না দেখে সেখানে পাইকারী জরিমানা করা হয়। পরে কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র প্রাসাদের নেতৃত্বে শান্তি ও সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠার সক্রিয় প্রয়াস হয়।

-১৯৪২-১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার প্রকোপ ছিল কম। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ১৩৫০ বাংলা সনে মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর গান্ধী জিন্নাহ্ সাক্ষাতকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার সমাপ্তি ইত্যাদি কারণেই দাঙ্গা কম হয়েছিল। তবে খুলনা-যশোর জেলায় বিক্ষিপ্ত দাঙ্গার খবর প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের ১৯৪৪ সনে ১১ জুলাই মাসে বিধান পরিষদের ভাষণ থেকে পাওয়া যায়।[১৯]

-১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ১২ই মার্চ কানপুরে এবং ১লা জুলাই থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত আহমেদাবাদে গুরুতর দাঙ্গা ঘটে, যাতে ৫৬ জন মৃত্যু ও ৪১০ জন আহত হয়। ১৬ই আগষ্ট শুরু হয় কলকাতার দাঙ্গা, এটি ছিল প্রত্যুত 'নরমেধ যজ্ঞ'। যার সূত্রপাত ঘটে মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এর মাধ্যমে। 'দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে ৪ দিনের এ নরমেধ যজ্ঞে ৫ হাজার মতান্তরে ১০ হাজার নর-নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয় এবং আহত প্রায় ১৫ হাজারের মত। কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট সহ নারীর সম্ভ্রমহানীর বহু ঘটনা ঘটে।[২০]

২৩শে আগষ্ট এলাহাবাদের দাঙ্গায় ৪ জন নিহত ছাড়াও ৪৩ জন আহত হয়। লীগের 'কালা দিবস' উদ্‌যাপনের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যপকভাবে ও ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে বোম্বেতে যে দাঙ্গা ঘটে তাতে মৃতের সংখ্যা প্রায় ২৪২ এবং আহতের সংখ্যা ৬০০ এর উপরে। ৯ই সেপ্টেম্বর টিপরা জেলায় দাঙ্গা অন্যদিকে ৫, ১৩, ২২-২৪, ২৬-২৮শে সেপ্টেম্বরে কলকাতায় দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। কলকাতার বৃহৎ দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল পাবনা প্রমুখ জেলাতে ছোট বড় দাঙ্গা শুরু হলেও ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব কোন নোয়াখালী, টিপরা (কুমিল্লা) ও সন্দ্বীপ এলাকায় একতরফা হিন্দু নিধন ও উৎপীড়নের যে দাঙ্গা শুরু

---

[১৮] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৬
[১৯] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৮
[২০] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হয় তা এর মধ্যে ভীষণতম। এতে ব্যাপক হত্যায় সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এ দাঙ্গার খবর মুসলীমলীগ সরকার প্রায় এক সপ্তাহ প্রকাশ হতে দেয়নি। এক হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৫০ হাজার নরনারী এ দাঙ্গায় প্রভাবিত হয়। এতে একতরফা ক্ষতি গ্রস্থ হয় হিন্দুরা। এ সময় ঢাকাতে ও দাঙ্গা এবং ছুরিকাঘাতের খবর শোনা যায় এবং আহমেদাবাদেও দাঙ্গা হয়।[২১]

কলকাতার দাঙ্গায় পীড়িত হিন্দু এবং নোয়াখালী দাঙ্গার ব্যাপকতার সংবাদের প্রেক্ষিতে বিহারে ২৫শে অক্টোবর প্রথমে ছাপরায় পরে পাটনায়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া, সাঁওতাল পরগণা জেলায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠে। এ দাঙ্গায় প্রধানতঃ ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলমানরা, রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীর নথি অনুযায়ী বিহারের দাঙ্গার মৃত্যের সংখ্যা ২৬৫৫ তবে পুলিশের গুলিতে নিহত এবং যেসব লাশ নদীতে ভেসে গেছে তার হিসাব নিলে মৃত্যের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি হবে।

২২-২৪শে অক্টোবর এবং ২৭শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর কলকাতায় দাঙ্গা উগ্ররূপ ধারণ করে। একই সময়ে ঢাকাতে ও দাঙ্গা উগ্রমূর্তি ধারণ করে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ৮ই নভেম্বর পশ্চিম উত্তর প্রদেশের হাপুরের নাগর দোলায় চড়াকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান যে দাঙ্গা হয় তার উগ্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে, গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়ে মীরাট, গাজিয়াবাদ হয়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়।[২২] ২রা ও ৩রা ডিসেম্বর ঢাকায় শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গা এতে নিহতের সংখ্যা ১০ জন। ৫ই ডিসেম্বর মহরমের দিন কলকাতায় দাঙ্গা শুরু এতে নিহত হয় ৭ জন। এরপর ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে দাঙ্গা শুরু হলে পুলিশের গুলিবর্ষণের মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে আসে।

-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের দাঙ্গা গুলোতে রাজনৈতিক কারণ ছিল ওতোপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দাঙ্গার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'মুসলীমলীগ ন্যাশনাল গার্ড' এবং 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক জঙ্গী সংগঠনের মাধ্যমে ধর্ম দ্বন্ধের চেতনা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন অবধারিত হওয়ায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় হিন্দু প্রভাব মুক্ত ও ক্ষমতা দখল একই ভাবে হিন্দু সংখ্যাগুরুর এলাকায় মুসলমানদের প্রভাব মুক্ত ক্ষমতা দখল সহ স্ব-স্ব ধর্মীয় প্রাধান্য দেখিয়ে পাকিস্তান বা হিন্দু স্থানে যুক্ত হবার প্রতিযোগিতার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা তথা ভারতে গৃহযুদ্ধের ভ্রাতৃহত্যার স্থিতি সৃষ্টি হলো।"[২৩]

-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ ও ১০ জানুয়ারী বোম্বেতে দাঙ্গা ১০ জন নিহত ও ১১০ জন আহত। ২৪শে জানুয়ারী ইউনিয়নিস্ট প্রধান মন্ত্রী খিজির হায়াৎ 'মুসলীমলীগ ন্যাশনাল গার্ড' ও 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশে ছোট লাটের নির্দেশে সংগঠন দুটি নিষিদ্ধ করলেও "ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলীমলীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এর ফলে পাঞ্জাবে লীগের শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সরকার বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত

---

[২১] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬৩
[২২] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬৫
[২৩] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬৬

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়; এ দাঙ্গা এতই ভয়াবহ হয়েছিল যে, যা খিজির হায়াৎ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং নিজে পদত্যাগ করেও থামতে পারেনি।

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ব্যাপক দাঙ্গা ঘটে। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে লাহোর অমৃতসরসহ ছ'টি শহরে প্রবলতর হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে দাঙ্গা চলে। ছোট লাট জেকিন্সনের পাঠানো প্রতিবেদনে দেখা যায় 'রাওয়ালপিন্ডির ডেপুটি কমিশনারের বিশ্বাস একমাত্র তার জেলাতেই হতাহতের সংখ্যা ৫০০০।' এ সময় উত্তর ভারতের আরো অনেক অংশের সঙ্গে বঙ্গ এবং বিহারে ও দাঙ্গার চিতা বহমান। মার্চ ও এপ্রিলের পুরো মাস পাঞ্জাবে দাঙ্গা হয়। ৩রা জুন কংগ্রেস ও আকালী দল দেশ বিভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের হাতে ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তর মেনে নিলে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে শুরু হয় ব্যাপক দাঙ্গা এবং পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম 'বাস্তুত্যাগ পর্ব'।

এদিকে দিল্লীতেও পালাক্রমে কার্ফু ও দাঙ্গা চলতে থাকে। ভারত বিভাজন কালীন সময় দাঙ্গার অগ্নি শিখায় দহনরত ভারতের সে সময়কার মৃত ও আহতের সঠিক সংখ্যা সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল; তবে পেনড্রেলমুন এর কাছাকাছি অনুমান করেছেন। তাঁর মতে, "ভারত বিভাজনকালীন দাঙ্গা সমূহে মোট মৃতের সংখ্যা ২থেকে ১০লক্ষ। লিওনার্দ মোজলের অনুমান পাকিস্তান থেকে ভারতে অমুসলমান প্রায় দেড়কোটি নরনারী শিশু উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে শরণ নিতে হয় যা অমুসলমান জনতার প্রায় ৪০%।"[২৪]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জঘন্যতম যে উৎপাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; তার প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে অগণিত নিরীহ নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশুর নির্মম হত্যা যজ্ঞ। ধর্মীয় ও গোষ্ঠী উন্মাদনার বড়াই করে হীন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা উপমহাদেশে 'রায়ট' এর মাধ্যমে মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে, বাঙালী-বাঙালীতে, পাঞ্জাবী-পাঞ্জাবীতে, কংগ্রেস-মুসলিমলীগে তথা ভারতীয়-ভারতীয়তে তৈরি করল চিরস্থায়ী শত্রুতা, বিভেদ, জিঘাংসার অগ্রযাত্রা ও রক্তের হোলি উৎসব। এর ফলে মানবতার জয়গানে ছেদ পড়ল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিশোধের চেতনায় বিতারিত হলো। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে বিপন্ন মানবতার এ ক্রান্তিকালে উপমহাদেশের জনসাধারণকে শুধু প্রাণে রক্ষার জন্য নয়; বরং রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং নাগরিকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মানব কল্যাণমুখী শান্তিময় জীবনের জন্যই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।

জাতীয় সংহতি ও জাতি গঠনের অন্তরায় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে উপমহাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় সংকটই দেখা দিলো জাতীয় সংহতি অর্জন ও জাতীয়তা গঠনে। সাম্প্রদায়িকতার কারণে 'ভারতীয় মধ্যবিত্তের অগ্রগতির

[২৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হলেও তা সুস্থ পাথে অগ্রসর হলো না। সাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্যে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী ও ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হলো জাতিতে। জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হটিয়ে জাতীয় রাষ্ট্র তৈরীর বদলে সৃষ্টি হলো কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধর্মীয় রাষ্ট্র। যে কারণে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান হলেও বিভিন্ন ধর্ম ভাষাভাষীর স্বাধীন ভারত উপমহাদেশের রাষ্ট্র সমূহে এখনও সম্প্রীতি, শান্তি, সমৃদ্ধির বদলে বিদ্রোহ, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা ও আন্ত কলহের মাধ্যমে রক্ত ঝরছে।

রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সমস্যার রাজনৈতিক যুক্তিপূর্ণ সমাধান না করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভেল্কিবাজী-তে শাসকশ্রেণী, ক্ষমতালোভী দল, সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জনতাকে ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে আপামোর সাধারণ জনগনকে হাতের পুতুল বানিয়ে ফায়দা লুটছে। এর ফলে বিভিন্ন প্রতিযোগী গোষ্ঠী তৈরী হয়ে অসন্তোষ বৃদ্ধি করছে। জাতীয় সংহতি হচেছ ব্যাহত এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তৈরী হয়ে রাষ্টেকে খণ্ডিত করে নতুন রাষ্ট্র তৈরী করতে যেয়ে সূচনা করছে দীর্ঘমেয়াদী (Protcted War) যুদ্ধের। জাতীয়তা গঠন মুখথুবরে পড়ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে। এতে করে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা, সহিংসতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, গোষ্ঠীদ্বন্ধ ও অরাজকতায় রাষ্ট্র আক্রান্ত হয়ে রুগ হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় 'জাতীয় ঐক্য বজায় রাখাই সম্ভতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সমুহের সর্বাপেক্ষা কঠিন রাজনৈতিক সমস্যা'।[২৫] চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের আধ্যাপক মাইরেন ওয়েনার যথার্থই বলেছেন- 'উপমহাদেশের রাজনৈতিক জীবন ক্ষেত্রে কুৎসিৎ জটিলতা উপমহাদেশের জাতীয়তা উন্মেষের প্রাককালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জের।'

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে কাশ্মীরের আঞ্চলিক জাতিগঠনের সমস্যা অর্থাৎ কাশ্মিরী হিন্দুদের সাথে কাশ্মিরী মুসলমান ঐক্যের বিভেদ এক দিকে যেমন কাশ্মীরের স্থানীয় সংহতির বড় সমস্যা যা বিচ্ছিন্নতাবাদী কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ আদায়ের একটি আন্তরায়। অন্যপক্ষে একই ভাবে কাশ্মীরীদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাদের ভারতীয় জাতীয়তার স্রোতে একাত্মার পরিবর্তে নিজেদের স্বাভাবিক জীবনকে যুদ্ধময় করে তুলেছে; যদিও ভারতের নাগরিক হিসেবে ভারত সরকার সকল বিষয়ে তাদের স্বাভাবিকের তুলনায় বিশেষ সুযোগ সুবিদা বরাদ্দ করেছে।

---

[২৫] মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ সমাজ ও রাজনীতি, পৃ-২০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে। চিহ্নিত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দল ছাড়াও দু'একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে গোষ্ঠী উন্মাদনা সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের হীনপন্থা ব্যবহার করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যকে বিনষ্ট করে বিভেদের মাত্রা বাড়াচ্ছে। আবার জাতীয় রাজনীতিতে 'প্রগতিশীল' 'প্রতিক্রিয়াশীল' এ মেরুকরণ করে জাতীয় উন্নয়ন কর্মপন্থা নির্ধারনের ঐক্যকেও করেছে পুরোপুরি দ্বিধাবিভক্ত। এর ফলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করতে না পেরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন স্বাধীনতার তিরিশ বছর পরও সচল হয়নি। দলীয় ও গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতা ক্ষমতার পালা বদলে জিঘাংসার প্রতিহিংসায় একজনের পরিকল্পনাকে অন্য জনে করছে ছুরিকাঘাত বিচার বিশ্লেষণহীন অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার মদদে।

বাংলাদেশের সামরিক শাসক জান্তারা নিজস্ব ক্ষমতার আসন স্থায়ী করার লক্ষ্যে ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিবর্তে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' স্থির করার মাধ্যমে রাজনীতিতে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করে। সাথে সাথে জনতাকে ঠেলে দেয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্রোতে। যদিও বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের তরফে এরকম কোন দাবী কখনও করা হয়নি। পরবর্তীতে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের বক্তৃতায় মসজিদে 'আযানের' পরিবর্তে 'উলুধ্বনি' তত্ত্ব ও নির্বাচন পূর্ব সময়ে 'ইসলামী পোষাক' পড়ার সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ অসাম্প্রদায়িক সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতায় সম্পৃক্ত করে। ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় নিজ জন্মভূমিতে হয় নির্যাতিত একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত সরকারের শাসনা. . আমলে।

৫ম সংশোধনীর ফলে তৈরী হয় 'বাঙালী' বনাম 'বাংলাদেশী' দ্বন্ধ। যা তৈরী করে গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িকতা; এর ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, জাতীয়তা ও ইতিহাস ক্রমান্বয়ে মেরুকরণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকেও দ্বিধান্বিত করছে। এটি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাজনীতি, কৃষ্টি, ইতিহাস চেতনা, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদির জন্য ভায়নক হুমকী স্বরূপ।

/ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি জাতীর সংস্কৃতির জন্য হুমকী স্বরুপ এবং এর বড় শত্রু। আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি নির্বিশেষে সকলের নিজস্ব কৃষ্টি স্বীকার ও অক্ষুন্ন রেখে একটি জাতীয় সংস্কৃতির মাধ্যমে সকলকে একত্রে করে বিশ্বে নিজেদের অবস্থান তৈরী করতে বদ্ধপরিকর। যা তৈরী না হলে জাতীয় ঐক্যগঠন ও সংহতি অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং এর ফলে কৃষ্টিদ্বন্ধ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দাড় করায় পরস্পরের প্রতিপক্ষে। /

Dhaka University Institutional Repository

বদরুদ্দীন উমর তাঁর সাম্প্রদায়িকতা গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে উপমহাদেশের হিন্দুরা বিশুদ্ধ ভারতীয় সবকিছুকে গ্রহণ করল তাদের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির ভিত্তি ভূমি হিসেবে। অন্যদিকে মুসলমানেরা উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশেষত বিশ শতকে যা কিছু বিশুদ্ধ ভারতীয় তাকেই মনে করল ইসলাম বিরোধী এবং মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। জাতীয়তা ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হওয়ার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টি অনুসরণ করল ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পথ। এ পথ ধরে তারা ভারতবর্ষের শ্যামল, সমতল, বনভূমি, গিরিদরী, উপত্যকা পরিত্যাগ করে উপস্থিত হলেন আরবের দুস্তর মরুভুমিতে; মিশর, ইরান, তুর্কীর নদী পাহাড় খন্দকে । ভারতের প্রকৃতি পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এজন্য হলো দোষ দুষ্ট। কাব্য সাহিত্যে তাই ভারতবর্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রকৃতির পরিবেশই তাদের হাতে পেল অধিকতর প্রাধান্য। এ মনোবৃত্তির ফলে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে বকুল, জবা ও শিউলি ফুল গঙ্গা, যমুনা ভাগীরথী হল বিজাতীয়।'[২৬] যে কারণে ভারত উপমহাদেশের জাতীয় সাংস্কৃতি গড়ার পথে বাধা পেল।

এমনিভাবে জাতীয় সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত হয়ে ভারতীয় জাতি গঠন তত্ত্ব বরকট হয়ে জন্ম হলো জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্ব। যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরী হয়ে মানুষের রক্তের স্রোতের উপর সৃষ্টি হলো 'পাকিস্তান' ও 'হিন্দুস্তান'। একই ভাবে পরবর্তীতে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মিলিত বাঙালী সংস্কৃতিকে তৎকালীন পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বোদ্ধারা ধর্মীয় ইঙ্গিতে কটাক্ষ করে। তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাঙালীর নিজস্ব কৃষ্টিকে অক্ষুন্ন রেখে পাকিস্তানের জাতীয় সংস্কৃতির সাথে একত্রে সহবস্থান করার পথকে রুদ্ধ করে দিল। এমনি ভাবে বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে পাকিস্তানের বিপক্ষে দাড় করিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সংখ্যা গরিষ্ঠ সমস্বত্ত ইসলাম ধর্মীয় কৃষ্টির পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে বাংলাদেশে উত্তোরণের পথ প্রসস্ত করল। সুতরাং রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে জাতীয় ঐক্যে একতাবদ্ধ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এক বিরাট অন্তরায়।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের আত্ম উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য সরকারের তথা রাষ্ট্রের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও স্বাধীনতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। দল, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নিরীক্ষে নয়

---

[২৬] বদরুদ্দীন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃ-২৮

Dhaka University Institutional Repository

মানবতা ও যোগ্যতার নিরীক্ষে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পুরণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি তথা মানবিক প্রয়োজনের সবকিছুতে রাষ্ট্রের সকল জনগনের ন্যায্য ও সমান স্বাধীনতা, অধিকার, সুযোগ, উপভোগ ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় সেটিই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যে কারণে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সমগ্র বিশ্বে এত জনপ্রিয় ও মানব কল্যাণের সেরা গ্যারান্টি।

অন্যক্ষেত্রে বিশেষ কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা, অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়াই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। কাঙ্খীত ধর্মীয় সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল ধর্ম হীন, পরিত্যাক্ত এবং সহবস্থানের অযোগ্য। সর্বোপরি ভিন্ন মতাবলম্বীদের অস্তিত্বহীনতাই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাম্য। সাম্প্রদায়িকতার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দল, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষ সকলে ন্যায্য অংশ গ্রহনের সুযোগ পায় না, যে কারণে গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পাকে পড়ে সাফল্যে উপনীত হতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এ সংকট জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের জন্য হুমকী স্বরূপ। এ প্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এবং রাষ্ট্রের বিকাশ সাধনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রধান অন্তরায়। কাজেই গণতন্ত্র ও কল্যাণ মূলক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে সম্প্রদায়িক রাজনীতি পরিতাজ্য।

পরমত সহিষ্ণুনতা গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠী, বিভিন্ন আদর্শের দল, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ভাষা এবং বিভিন্ন জাতি উপজাতির সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হবে এটাই বাস্তবতা। এ বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের সেতু বন্ধ রচনাই গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নিজস্ব দলীয়, মতাদর্শিক, গোষ্ঠী, জাতি সর্বোপরি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য সব কিছুকে নিষিদ্ধ এবং নিশ্চিহ্ন করা হয়। যে কারণে সুষ্ঠ রাজনৈতিক চর্চ্চার পরিবর্তে এখানে ক্ষমতাধরদের প্রতাপ চলে। উল্লেখ যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি ক্ষমতাসীনরা কি পরিমান মারমুখী হয় সম্প্রতি ২০০১ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তানে হাজার বছরের পুরানো এবং পৃথিবীতে বিরল বৌদ্ধ অবাক্ষ গুলো কামান দিয়ে ধ্বংষ করা তার উলঙ্গ প্রমাণ। সমগ্র বিশ্বের আবেদন নিবেদন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আগুন থেকে প্রাণহীন পাথরের প্রতিমা গুলোকে রক্ষা করতে পারেনি। এ থেকে সহজে প্রতীয়মান হয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির থাবা মানবতার জন্য কত বিভৎস ও ভয়ংকর।

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি মানুষ ও মানবতা নিধনের উৎস। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎপাদ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ধর্মীয় পুণ্যের আলোকে এক সম্প্রদায়ের লোক দ্বারা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিরীহ, নিরপরাধ জনগনকে হত্যা করে রক্তের হোলি খেলার উৎসব সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম স্বীকার্য। ধর্মীয় নিরীক্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এ হত্যা যজ্ঞের বৈধতায় পরলৌকিক স্বার্থের পক্ষে গ্যারান্টি দেয় ও ধর্মপ্রান মানুষকে অন্য পক্ষের বিপরীতে খুন, ব্যভিচার, লুট ও দাঙ্গায় প্রলুব্ধ করে। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার বিশ্বায়নের এ যুগে এ বিষয়টি নিঃসন্দহে মানবতার চরম লংঘন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়; প্রথমতঃ এটি বিপক্ষ প্রতিবেশীর মধ্যে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ এর সমাপ্তি হয় অমীমাংসিত। যে কারণে এলাকার লোকদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন ভাব থাকে নিরন্তর। অন্য দিকে পরবর্তী দাঙ্গার জন্য মানুষের মধ্যে চলতে থাকে জোর প্রস্তুতি, সুযোগ পেলেই এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ঘায়েলে সঙ্গীন থাকে। এটি একটি মারাত্মক সামাজিক ক্যান্সার । মানুষের মধ্যে মানুষের বিশ্বাসকে উপড়ে ফেলে সুস্থ সামাজিক কাঠামো করে চুরমার।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়া কালীন সময়ে ভয়াবহ দাঙ্গা থামানোর প্রচেষ্টার বদলে মুসলীমলীগের পুরোধা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র একমাত্র অভিমত ছিল যদি হিন্দু মসলমান সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে দেশ ভাগ না করা হয় তবে এ দাঙ্গা বাড়তেই থাকবে। সাম্প্রদায়িক দেশ বিভাগই এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার একমাত্র বাস্তব সমাধান। এর ফলে মহাত্মা গান্ধীর অবিভক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপরেখা চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং সম্প্রাদায়ের ভিত্তিতে দেশভাগ চূড়ান্ত বাস্তবায়ন হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পরও উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলোৎপাটিত হয়নি । সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উৎপাদ যে 'সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা' তা হচ্ছে 'সামাজিক ক্যান্সার'[২৭] দাঙ্গা আজো বন্ধ হয়নি ।

কোলকাতা, পূর্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে দেশ ভাগ কার্যকরী হওয়া শুরুতেই রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার ঘটে। পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের রক্তে প্লাবিত হয়ে গেল। লিওনার্দ মোজলে তাঁর ব্রিটিশ রাজের শেষ অধ্যায় গ্রন্থে লিখেন, ''প্রায় দেড় কোটি হিন্দু শিখ এবং মুসলমান পৈত্রিক ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিল রক্ত পাগল জনতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষার

[২৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬

Dhaka University Institutional Repository

জন্য। ঠিক একই সময় ছয় লক্ষাধিক মুসলমান হিন্দু এবং শিখ নির্মম ভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়েছিল। একে শুধু হত্যাকান্ড বলা ঠিক হবে না। এ হত্যাকান্ড ছিল খুবই পাশবিক।''[২৮]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে মহাত্মা গান্ধীর অত্মোৎসর্গের পর জনমনে সংবেদনশীলতা জাগ্রত হয়ে সৃষ্টিশীল বৃত্তির অবির্ভাব ঘটে; ফলে কয়েক বছর দাঙ্গা বন্ধ থাকলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে তা আবার বেগবান হয়। ইংরেজী ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে যে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তা ছিল বীভৎস ও ভয়ংকর। শুধু পুব বাংলায় নয় ভারতের পশ্চিম বাংলায় আসামে ও বিহারে একই সময় এ দাঙ্গা ঘটে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১০.০২.১৯৫০ তারিখে লেখা তাঁর ডাইরীতে উল্লেখ করেছেন-''দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নবাবপুর, সদরঘাট, ইসলামপুর, ডিগবাজার, ইংলিশরোড, বংশাল, চকবাজার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঘুরে মুসলমানরা হিন্দুদের যে ক্ষতি করেছে তা দেখে বেড়ালাম.... বিশেষ নোটঃ স্বাধীনতার পর এই প্রথম আজ দুপুর ১২টা থেকে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছে। এর কারণ কলকাতায় হাঙ্গামা বিশেষত গত তিন/চার দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত লুটতরাজ, হত্যা, এবং অগিদাহ্য অপ্রতিরোধ্য ভাবে চলল। এসব থামাবার জন্য পুলিশ কিছুই করল না সমগ্র প্রশাসন নীরব দর্শকের ভুমিকা গ্রহন করল।''[২৯]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুধু ঢাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরিশাল, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর ও রংপুরে ব্যপক ভাবে হয়েছে। লন্ডনের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান ও ইকোনমিস্টের প্রতিনিধিরা ইংরেজী ১৯৫০ সালে পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বাংলা সফর করে দাঙ্গা পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ ও সেসময়কার ঘটনাবলীর উপর বিস্তারিত প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করেছেন 'Reporting India' গ্রন্থে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভীত হয়ে কুমিল্লার হিন্দুরা যখন জীবন বাচাঁতে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে ছিল, সে সময়কার পরিস্থিতি ও ভৈরব সেতুর কাছে উদ্বাস্তু ট্রেন যাত্রীদের হত্যা সম্পর্কে তায়া জিনকিন লেখেন-

''ট্রেন নদী পার হয়ে যখন ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে প্রবেশ করে তখন সেটিকে সেতুর উপর ঘেরাও করা হলো। ইঞ্জিনের ড্রাইভার ইচ্ছে করে ট্রেনটা থামিয়ে দিয়েছিল। সেতুর দুই দিক থেকেই খুনীর দল যাত্রীদেরকে আক্রমণ করল। যারা নিরাপত্তার জন্য

---

[২৮] লিওনার্দ মোজলে, ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়, পৃ-৬৮
[২৯] কল্পকল সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৯২

Dhaka University Institutional Repository

নদীতে ঝাপিয়ে পড়ল এবং সাঁতরে তীরের দিকে যেতে চেষ্টা করল তাদের মাথায় ইট মেরে তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হলো।''[৩০]

এর মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দেশের সংসদে এক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। ''পাকিস্তানকে হুমকি প্রদান করে তিনি বললেন যে, পাকিস্তান যদি তার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে না পারে তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্য ভারত অন্য ব্যবস্থা করবে।''(২৩.২.৫০) ''পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী উত্তর দিলেন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনেঃ ভারত যদি যুদ্ধ চায় তাহা হইলে তাহারা আমাদিগকে সম্পূর্ন প্রস্তুত পাইবে।''(২৮.২.৫০)[৩১] এ হচ্ছে মানবতা লংঘন ও মানুষ নিধনে সাম্প্রদয়িক রাজনীতির বাস্তবতা। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যপক ভাবে চলে। পরে এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে দিল্লীতে ঐতিহাসিক ''নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি'' স্বাক্ষরিত হয় এবং দাঙ্গা সাময়িক থেমে যায়। সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার সম্পর্কে সেখানে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাছে মানবতার চুক্তি কিছুই নয়।

১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে আবার শুরু হয় সাম্প্রদয়িক দাঙ্গা। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ঘোষিত হয় যে কাশ্মীরের শ্রীনগরে হযরতবাল দরগা থেকে হযরত মোহাম্মদের পবিত্র চুল চুরি গয়ে গেছে। ১৯৬৪ সনের ৪ঠা জানুয়ারী ঐ পবিত্র কেশ আপনা আপনি রহস্য জনক ভাবে ফিরে পাবার কথা ঘোষণা করা হলেও ১৯৬৪ সনের ৩রা জানুয়ারী খুলনা ও যশোরে মোহাম্মদের চুল চুরি যাবার ক্ষোভে ব্যপক দাঙ্গা হয়। এতে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের প্রচুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেয়। '১৯৬৪ সালে পশ্চিম বাংলায় রেজিষ্ট্রিকৃত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৬,৬৭লক্ষ।[৩২]এ থেকে সহজে অনুমেয় এ সময় দাঙ্গা কত ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার দাঙ্গা বন্ধ এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। এ প্রসঙ্গে গোলাম কিবরিয়া তাঁর Minority Politics in Bangladesh গ্রন্থে উল্লেখ করেন, The 1964 riot was the most serious instance of communal strife since 1950.....The riot brokeout this, time at the instigation of some of the leaders of Ayub's convention Muslim League.[৩৩] এ থেকে সহজেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নরবলীর

---

[৩০] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৯৪
[৩১] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৫০
[৩২] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-১১৭
[৩৩] Golam kabir, Minority Politics in Bangladesh, p-74

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্য অনুমেয় । দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের নিগৃহীত হবার কাহিনী প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, বিহারের সিংহভূম জেলার জামশেদপুর ও অন্যত্র একাধিক মুসলিম নিগ্রহকারী কাহিনী দাঙ্গায় ফুটে উটে।''[৩৪]

এর প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববাংলা বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার লাঙ্গলবন্ধ, বন্দর, গোদনাইল, রূপগঞ্জ, পাগলা, সোনরগাঁও, ফতুল্লাসহ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বিরোধী প্রবল দাঙ্গা শুরু হয়। এতে প্রচুর উদ্বাস্তু ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার নতুন উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও পূনর্বাসনের জন্য সরাসরি দণ্ডকারণ্যের মানা ক্যাম্পে বিশেষ ট্রেনের দ্বারা পাঠানোর সিদ্বান্ত নেয়। ৬ই মার্চ থেকে রাউর কেলা স্টেশন হয়ে বিশেষ ট্রেন গুলো দণ্ডকারন্যে যাওয়া শুরু করে । ''উদ্বাস্তুদের দিনের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাউরকেলা স্টেশনে হয়েছিল বলে গাড়ীগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য সেখানে দাঁড়ায়।.....সেই সময় শত শত স্থানীয় অধিবাসী নিঃস্ব, অপমানিত ও আহত উদ্বাস্তুদের দেখার ও তাঁদের দঃখ-দুর্দশার কাহিনী শোনার সুযোগ পান । নাগরিকদের তরফ থেকে উদ্বাস্তুদের খাদ্য সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত কয়েকজন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ও জন সংঘের সমর্থক, কর্মী এই অবসরে ১১ই মার্চ স্টেশনে মাইকের সহায়তায় তাঁদের পাকিস্তান ও মুসলমান বিরোধী বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেন।''[৩৫] ফলে রাউরকেলা ও আশে পাশে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে।

এখানেই শেষ নয় বরং পরবর্তী বছর গুলোতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী 'কেবল ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে ৬২৫৮টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে যার অর্থ হলো দৈনিক গড়ে প্রায় ২০টি ঘটনা। ১৯৮৩ সালে ভারতে দাঙ্গার সংখ্যা ৪০০০ এ দাঁড়ায়। কেবল আসামের দাঙ্গাতেই মার্চ মাসে ৩৫০০ জনের মৃত্যু ঘটে।'[৩৬]

১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে ডিওয়ানডি ও বোম্বে কর্ণাটকের বেলগাঁও এর উত্তর প্রদেশের স্থানে স্থানে। ১৯৮৫ সনে আহমেদাবাদ, ১৯৮৬ সনে মহারাষ্ট্রের পানওয়েল, নাসিক, উরাঙ্গবাদ, জমরাবতী, পারভানি ও অনত্র; এবং এলাহাবাদ ও ওয়াবুদ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। ১৯৮৭ সনে মীরাট ও দিল্লী । ১৯৮৮ সনে কর্নাটক, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয়।

১৯৮৯ সনে বিহার, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের দাঙ্গায় প্রায় ৬০৭ জনের মৃত্যু ঘটে।

পরবর্তীতে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রামমন্দির বাবরি মসজিদ বিতর্কে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দাঙ্গায় অনেক লোক মৃত্যু বরণ করেন। ''সরকারী হিসাবে এই

---

[৩৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৮১
[৩৫] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৮১

Dhaka University Institutional Repository

মৃতের সংখ্যা ৬৩২ জন হলেও (বেসরকারী) অনুমান অনুসারে এই সংখ্যা দুই তিন গুন হবে ।[৩৭] যার ঢেউ বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানেও আলোড়িত হয় এর ফলে এখানেও সংখ্যা লঘু হিন্দুদের সহস্রাধিক মন্দির ভাংচুরসহ ধর্ষণ, লুটপাট, সহায় সম্পত্তি বেদখল, মারপিটসহ মৃত্যু ও হিন্দুদের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে। তবে এসকল ঘটনা বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে সরকারী ভাবে প্রকাশ হতে দেয়া হয়নি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে পাকিস্তানে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌনঃপুনিক দাঙ্গায় যে ক্রমবর্ধমান মানুষ নিধন হচ্ছে তা সভ্য সমাজে কোন ভাবেই গ্রহন যোগ্য নয়।

১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক চেতনার মূলোৎপাটিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে সামরিক শাসনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোড়া পত্তন ঘটে ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে। এরপর থেকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ জনগণের মনোজগতে তৈরী করা হতে থাকে সাম্প্রদায়িকতা। ফলে সাম্প্রদায়িকতার কৌশলগত নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রায় কয়েক লক্ষ হিন্দু সংখ্যালঘু ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এটি সরকার প্রকাশিত সাল ওয়ারী জনসংখ্যার পরিসংখ্যান থেকে সহজে প্রমানিত। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নির্যাতন এখানে প্রকাশ্য হত্যার মাধ্যমে ঘটেনি। ঘটেছে অর্থনৈতিক নির্যাতন, ভীতিপ্রদর্শন, সম্পত্তি বেদখল, নারীর সম্ভ্রমহানী, চাকুরী, ব্যাংকঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য ও নিপীড়নের মাধ্যমে। ইংরেজী ২০০১ সনের ১লা অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে ব্যপক নির্যাতন, হামলা, হত্যা, ধর্ষন, সম্পত্তি বেদখল, মন্দির অপবিত্র করা ও লুটতরাজ হয়েছে তা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির থাবা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে করে অনেক সংখ্যালঘু ভারতে পারি জমায় নিজের ভিটামাটি ছেড়ে নিরাপত্তার লক্ষ্যে।

রাজনীতির আড়ালে সাম্প্রদায়িকতার এ যে প্রকাশ্য নরহত্যা, মানুষের ভিটামাটি উচ্ছেদ, মানুষের সাথে মানুষের চির শত্রুতার সম্পর্ক তৈরী তা শুধু কোন রাষ্ট্রের সুস্থ রাজনীতির জন্য হুমকী নয় মানবতার ও চরম লংঘন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এক জঘন্যতম কলংক জনক বিষয়। বিভেদ নয় মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান এর বিস্ময়কর উন্নতির এ যুগে পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি পরিবারে অর্ন্তভূক্ত করাই বর্তমান বিশ্বায়নের লক্ষ্য। কিন্তু বিশ্ব মানবতাকে এক সূত্রে গাঁথার পথে

---

[৩৬] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৭৭
[৩৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৭৯

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হচ্ছে দুর্লঙ্ঘ্য অন্যতম বাধা। কাজেই কল্যাণের লক্ষ্যেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবশ্যিক পরিত্যাজ্য।

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের পরিপন্থী হচ্ছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। সামাজিক যোজনা (Social Mobilization), অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development), এবং জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রের (Nation State) গোড়াপত্তন রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। এ নিয়ামক গুলোকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে কতগুলো সমস্যা ও সংকট কাটিয়ে উঠতে হয়। যে সমস্যা ও সংকট উল্লেখিত নিয়ামক গুলো বাস্তবায়নে বাধা দেয়। এগুলো হচ্ছে- একাত্মতার সংকট, বৈধতার সংকট, অনুপ্রবেশের সংকট, অংশগ্রহনের সংকট, সংহতির সংকট এবং বন্টন সংকট । সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এ সমস্যা ও সংকট গুলোকে সক্রিয় মদদ দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণকে বাধা দান করে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন বাংলা প্রদেশটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীতাকামী অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিস্ফোরণ উপমহাদেশকে আলোকিত করে । প্রধানতঃ হিন্দু মধ্যবিত্তরা এ আন্দোলন সংগঠিত করে ও নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে পূর্ববাংলা একটি পৃথক প্রদেশ হয়েছিল এবং বামফিল্ড ফুলার যিনি তখন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, ''সরকার মুসলমান সম্প্রদায়কে তার প্রিয়তমা স্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করে।''[৩৮]

বৃটিশদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এ কূটচাল তখন হিন্দু মুসলিম একতাকে করে বিপন্ন। সেসময় জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য সংহতি অর্জন, রাষ্ট্রীয় কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত, ন্যায্য অধিকার বন্টন, পরস্পর পরস্পরের মর্যাদার স্বীকৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের পরিবর্তে সংকট সমূহ বরং ঘনীভূত হয়। এতে করে একই রাষ্ট্রে দু'টি জাতিসত্তা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে তৎকালীন উপমহাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নকে করে পর্যুদস্ত।

মূলতঃ হিন্দুরা ভাবতে শুরু করে যে, সমস্ত মুসলমানরাই ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধী। এর ফলে স্বাধীনতা অর্জনে বিট্রিশ বিরোধী বিপ্লবী সংগঠনে মুসলমাদের সদস্য করা হত না, যদিও মুসলমানদের ভারতীয় সংগ্রামে সামিল করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন-''আমি তাদের সাথে

---

[৩৮] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-৬

Dhaka University Institutional Repository

যোগদান করতে ইচ্ছুক তখন তারা দারুন ভাবে বিস্মিত হয়েছিল। প্রথম দিকে তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি, আমাকে তারা অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণা সভা গুলোর বাইরে রাখার চেষ্টা করত। কিছু সময় পরে তারা ভুল বুঝতে পারে এবং আমি তাদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হই।''[৩৯] এটি ছিল সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা গঠনের পথে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষাক্ত ছোবল।

(বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিপক্ষ হিসাবে এবং সফল হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা ও চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। যে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মিলিত আত্মদানে মাত্র নয় মাসে স্বাধীন দেশ ও বাঙ্গালী জাতি হিসেবে বিশ্বে আত্মমর্যদা পেয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ।) কিন্তু স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোড়াপত্তন ঘটে।

যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ বাংলার হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তার ঠিক পাঁচ বছর পর ৭ই মার্চ ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের নির্দেশে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রসাশক সামরিক আইনের বৈধতার পক্ষে ইসলামী জলসা করলেন। এ বিষয়ে কংকর সিংহ তাঁর সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালগু সংকট গ্রন্থে পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, ''জনসমাগমে ভাষণ দিলেন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তাওয়াব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার দাবি করলেন তিনি। জনসমাগম থেকে শ্লোগান উঠল মুহমুহুঃ তাওয়াব ভাই তাওয়াব ভাই, চাঁদ তারা পতাকা চাই।''জামাতে ইসলামী দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ সভায় আলবদর, রাজাকাররা সংগঠিত হয়ে তাদের শক্তি প্রর্দশন করল, সভায় গৃহীত হল ৬ দফা দাবি সনদ। দেশের পতাকা বদলাতে হবে, নতুন জাতীয় সংগীত চাই, দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে। ৫২এর মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনার ভেঙে দিতে হবে। মুক্তি যুদ্ধের সময় নিহত রাজাকারদের স্মরণে মিনার নির্মাণ করতে হবে।''[৪০] সরকারী সমর্থনে স্বাধীন বাংলাদেশে বোনা হলো সাম্প্রদায়িকতার বীজ।

---

[৩৯] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, অসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইণ্ডিয়া ডিভাইডস ফ্রিডম, পৃ-৬

[৪০] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংখ্যালগু সংকট, পৃ-২০৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ধর্ম নির্বিশেষে সকলের আত্মবলিদানে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮নং ধারায় বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু সামরিক সরকার ১৯৭৬এর জুলাই মাসে রাজনৈতিক দল বিধি অর্ডিন্যান্স জারি করে তা বাতিল করে দেন। ফলে সাম্প্রদায়িক দল গঠনের পথ আর অবরুদ্ধ থাকল না। মুক্তি সংগ্রামের রক্তে যে সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রয়াশীল শক্তি পরাভূত হয়েছিল, সামরিক শাসক তাদের পুনর্বাসনের সুযোগ করে দিল। ১৯৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি হয়ে ফরমান জারির মাধ্যমে সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনেন। তিনি সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার উপরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কথা গুলো সংযোগ করেন এবং 'অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে' বাতিল করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কাজের ভিত্তি বলে ঘোষণা করেন।[৪১] এমনি ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সাম্প্রদায়িকতা মদদ পেয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশে বিকশিত হতে থাকল বিপুল উৎসাহে রাজনীতিতে এবং সমাজে।

বাংলাদেশে শুরু হলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অগ্রযাত্রা। এর ফলে বৈধতা, একাত্মতা, অংশগ্রহণ ও অনুপ্রবেশের সংকট ঘনীভূত হয়ে এখানকার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে করল রুদ্ধ। একই সাথে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, বাঙালীত্ব, মুক্তি সংগ্রামের বৈধতাকে বির্তকের সম্মুখীন করে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের পক্ষে মানসিকতাকে করা হলো বেগবান। ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিকশিত সমস্বত্ত বাঙালী জাতির মৌলিক ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনায় তৈরী হলো বিভেদ। এর মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের মধ্যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ছাড়াও ও একই ধর্মের মানুষের মধ্যে তৈরী করা হলো দলীয় সাম্প্রদায়িকতা। যে কারণে স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরও বাংলাদেশের কাংখিত উন্নয়ন হয়নি। দলীয় সাম্প্রদায়িকতার রেষারেষি আর হিংসায় উন্নয়নের পরিকল্পনা মুখ থুবরে পড়েছে। ফলে চরম দারিদ্রতার করাল গ্রাসে গণমানুষের জীবন হয়েছে স্থবির। এর ফলশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় সমস্বত্ত সামাজিকতার নবীন এ উদ্যোমী জাতিটিও উন্নয়নের পরিবর্তে পড়েছে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃংখলার চরম সীমায়।

প্রতি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন সম্প্রদায় গুলো যদি রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ন্যায্য ভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ না পায় তবে কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কোন ক্ষেত্রেই

---

[৪১] মোঃ আব্দুল হালিম, সংবিধান,সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, পৃ-১০৬

Dhaka University Institutional Repository

তারা তাদের মেধা, বিবেচনা, দক্ষতাকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী হবে না। বরং সুযোগের অভাবে বিকল্প বিচ্ছিন্ন, সংকীর্ণ চিন্তা করে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও সার্বিক অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করবে। জাতি রাষ্ট্রকে সম্প্রদায় ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সত্তায় বিভক্ত করার মদদ পাবে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যেহেতু বিশেষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়কে সুযোগ দেয়; ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে করে রুদ্ধ; সে প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কোন উন্নয়নই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হিংসা দ্বারা অগ্রসর হতে পারে না। কাজেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আধুনীকরণ ও উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক।

বর্তমানে উপমহাদেশের রাজনীতিতে গুন্ডা, সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্য সুস্থ, জনকল্যাণমুখী রাজনীতি ও যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশের জন্য এক বড় সংকট। রাজনীতিতে ক্রমশ এ 'গুন্ডা' তথা 'সন্ত্রাসী' প্রভাবশালীদের অনুপ্রেবেশ এবং এর গোড়াপত্তন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই ফল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলেই উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে 'গুন্ডাদের' গোড়াপত্তন ও পুনর্বাসন ঘটে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উল্লেখযোগ্য যোগান হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা । এ দাঙ্গার মাধ্যমেই 'গুন্ডা' সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা উপাস্থাপন করে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে নিজেদের আসন পাকা পোক্ত করে নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততায় উপমহাদেশে যে ভয়বহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এর পর থেকেই 'গুন্ডা' উপমহাদেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নেতা সাজার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হত্যা যজ্ঞের দিন গুলোতে ব্যপক ভাবে আগেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার হয়। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে এ গুলো সহজ প্রাপ্য ছিল। পাড়ার গুন্ডা ও সমাজ বিরোধী যারা 'পাড়ার ছেলে' নামে পরিচিত ছিল, তারা এ দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ সময়ে স্বধর্ম রক্ষার পাহারাদার হিসেবে মদদ পেয়ে পাড়ার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের 'আত্ম রক্ষার' মহৎ উদ্দেশ্যে ছুরি, বন্দুক, বোমা চালনা ও দাঙ্গার মানসিকতায় দক্ষ করে তোলে। রাষ্ট্রীয় চরম বিশৃংখলার দিন গুলোতে নিজ নিজ ধর্মীয় বলয়ে ধর্মীয় সম্প্রদায়কে রক্ষা করার বিষয়ে স্বধর্মীয় গুন্ডাদের দাঙ্গার দক্ষতা তখন সাধারণ মানুষের জানমাল নিরাপত্তার জন্য খুব জরুরী হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তৈরী রায়টে আপামোর সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার গ্যারান্টিহীনতার সময় গুলোতে মানুষের একমাত্র আশ্রয় হিসাবে গুন্ডারাই তখন ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। 'গুন্ডা' শ্রেণী জনসমাজে ঘৃণিত হলেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বদৌলতে দাঙ্গায় ভুমিকা পালনের মধ্য দিয়ে ত্রাতা হিসাবে ক্রমশ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে ''১৯৪৬ সাল থেকেই ভারতের অর্থাৎ কলকাতার নরমেধ যজ্ঞের সময়ই বঙ্গ এবং ভারতের সর্বত্র সমাজ ও রাজনীতিতে মেলামেশার অযোগ্য সমাজ বিরোধী গুন্ডা শ্রেণীর মর্যাদা লাভের সূচনা হয়। এ সময় থেকেই 'গুন্ডারা' শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংক্রমিত করে সমাজে নেতৃত্ব পাবার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হতে লাগল। কালক্রমে এ অগ্রগতি এতই তীব্র হল যে, বিশ বছরের মধ্যে 'গুন্ডা' ভদ্র লোক রাজনৈতিক নেতার সহায়ক হবার বদলে লোক সভার সদস্য ছাড়াও মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করতে আরম্ভ করল কংগ্রেস, কংগ্রেস বিরোধী এবং বাম দলে।[৪২]

এ প্রসঙ্গে স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য-''১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেই ভয়াল ব্যক্তি; পাড়ার 'গুন্ডা' তাকে কেবল একদা সমাজ কর্তৃক নির্বাসিত ভূমিগত জগৎ থেকে আলোয় নিয়ে আসেনি, তাকে 'হিরো' বা নায়কের ভঙ্গিমা গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। স্বসম্প্রদায়ের মানুষ ও জীবন রক্ষার প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে সে নেতায় পরিণত হয়েছে। নিজের পাড়ায় তার অভিধা এখন 'দাদা'।[৪৩]

এ থেকে সহজেই অনুমেয় উপমহাদেশের সুস্থ, নির্মল রাজনীতিতে জঘন্য, মারাত্মক এবং দাপটধারী অশুভ স্বত্বা 'সন্ত্রাসী' সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই সৃষ্টি। শুধু সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেনি; রাজনীতিতে এর প্রচলণ, সামাজিকীকরণ এবং স্বীকৃতির বিষয়টিও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই নিশ্চিত করেছে। যার করাল গ্রাসে উপমহাদেশের রাজনীতি আজ তটস্থ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মদদে সন্ত্রাসী কার্যক্রম ধর্মীয় জেহাদের লেবাসে বৈধ হয়ে 'গুন্ডাদের' রাজনীতিতে পুনর্বাসনের পথকে প্রশস্ত করেছে। একই ভাবে বাংলা-পাক-ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সকল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে 'সন্ত্রাসী ক্ষমতার মাত্রা' একটি অন্যতম যোগ্যতা হিসাবে অলিখিতভাবে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এই তথাকথিত ক্ষমতাবান গুন্ডামী নেতৃত্বের কাছে সৎ, যোগ্য, বিচক্ষণ নেতৃত্ব পরাস্থ হয়ে রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকান্ড থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখছে। এর ফলে শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয় তৃণমূল পর্যায়েও উপমহাদেশে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট তৈরী করে একটি বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। যোগ্য নেতৃত্বের সংকটই আজ উপমহাদেশের রাজনীতির এক অন্যতম বৃহৎ সমস্যা। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই উপমহাদেশের রাজনীতি আজ অস্থিতিশীল, প্রতিহিংসা, জিঘাংসায় সংক্রমিত হয়ে নুব্জ্য হয়ে পড়েছে। যে কারণে এতদঞ্চলের সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পিছিয়ে পড়ে তাদের জীবন যাত্রাকে চরম অশান্তি ও দারিদ্রতার করাল গ্রাসে ঠেলে দিচ্ছে।

---

[৪২] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬১

[৪৩] The Stateman, The local Bully Again Flourishers, 3 June, 1954.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থান

গান্ধী কথাটি গুজরাটি ভাষায় 'গন্ধ বণিক' মুদি অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর উর্ধ্ব তিন পুরুষ দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করেছেন। পিতামহ উত্তম চাঁদ পোরবন্দরের রাজার মন্ত্রীছিলেন।[১] মহাত্মা গান্ধীর পিতা করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন সূক্ষ্ম ও উচ্চমানের জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি পোরবন্দর (গুজরাট, আহমেদাবাদ) রাজ্যের দেওয়ান তথা মন্ত্রী ছিলেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তাঁর সুনাম ছিল। যে কারণে এক সময় তিনি যথাক্রমে পোরবন্দর, রাজকোর্ট ও বন্ধার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব ও করেন। কিন্তু ব্যারিস্টার গান্ধীছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির। লন্ডনের ইনার টেম্পল থেকে পাশ করা এবং ল্যাটিন, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় দক্ষ এ ব্যারিস্টার মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নৈতিকতা ও নিরতিশয় লাজুকতার জন্য আইন ব্যবসায় সফল কাম হতে পারেননি। এ সময় তিনি ব্যারিস্টারী করার পরিবর্তে আর্জি লিখে জীবিকা নির্বাহে সচেস্ট হন; কিন্তু এতে করে তার সাংসারিক ব্যয় চালানো কষ্টকর হয়ে পরে।

১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে গান্ধী পোরবন্দরের ব্যবসায়ী শেঠ আব্দুল করীম যাভেরীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'আব্দুল্লা এন্ড কোম্পানী'র দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কোম্পানীর ব্যবসা সংক্রান্ত মোকদ্দমার কাজের জন্য চাকুরীতে নিযুক্ত হন। চাকুরী উপলক্ষ্যে ঐ বছরই এপ্রিল মাসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। সেখানে তাঁর কাজ ছিল কোম্পানীর মক্কেলের হয়ে কোম্পানীর নিযুক্ত বড় বড় নামকরা উকিল ও ব্যারিস্টারদের মোকদ্দামা বুঝিয়ে দেয়া, ব্যারিস্টারী করা নয়। পরে তিনি নাটালে সুপ্রীম কোর্টে সর্বপ্রথম ভারতীয় আইনজীবি হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের উপর যেভাবে বর্ণবৈষম্য নীতির ভিত্তিতে নির্যাতন চালাচ্ছিল তা গান্ধীজীর বিবেককে প্রচন্ড ভাবে নাড়া দেয়। তিনি নিজেও একাধিকবার শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত হন। 'একবার তিনি ডারবান থেকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে রেলে করে প্রিটোরিয়া যাচ্ছিলেন। ট্রেনের কামরায় এক শ্বেতাঙ্গ যাত্রী বর্ণবৈষম্যর হিংসায় গান্ধীকে কৃষ্ণাঙ্গদের দলে ফেলে তাকে লাঞ্ছিত করে

[১] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

পথিমধ্যে মরিৎসবুর্গ ষ্টেশনে নামিয়ে দেয়। প্রচন্ড শীতের মধ্যে গান্ধী সেখানে সারা রাত কাটান। তখনই তার মনে আন্দোলনের গোড়াপত্তন ঘটে।' সে সময় থেকেই তিনি বন্ধুর মত নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে সংগ্রাম ব্রতী হন। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার সূত্রপাত ঘটে।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে নাটালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশ ফিরে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের বহু অভাব, অসুবিধা দুর করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। এ বছরই পুনাতে *'গোপাল কৃষ্ণ গোখলে'*র সাথে মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ ঘটে এবং যাঁর রাজনৈতিক চিন্তা গান্ধীজীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। His political mentor on the Indian scene way was Gokhale " Servents of India" party. পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু হিসেবে গোখলেকে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে গান্ধীজী পুনরায় স্বপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে যখন ডারবানে অবতরণ করেন তখন প্রবাসী ভারতবাসীগন তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানান। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বোয়ার (বুর) যুদ্ধে ভারতীয়দের দ্বারা গান্ধীজী একটি এম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করেন ও 'যুদ্ধ পদক' পান এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ফিরে আসেন। অতপর ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ট্রান্সভালে এশীয়দের বিরুদ্ধে আইন প্রবর্তনের বিপক্ষে আন্দোলন চালানোর জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হয়ে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন এবং ট্রান্সভালে এ বছরই সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী রূপে তালিকাভুক্ত হন।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে *রাসকিন* রচিত 'আনটু দি লাস্ট' বইটি পড়ে অভিভূত হন- Ruskin's Unto This Last had brought to him the value of a life of simplicity and the dignity of manual labour.[৩] গান্ধী ডারবানের নিকট ফিনিক্স উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং 'ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামে পত্রিকা বের করেন। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে জোহানিসবার্গে একবার প্লেগ মহামারী আকরে দেখা দিলে তিনি হাসপাতাল সংগঠন করে রোগীদের সেবা করেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে যুলু বিদ্রোহে আহতদের খাটুলি বাহক রূপে ভারতীয় দল(Core) গঠন করে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এ সময় থেকেই তাঁর আমরণ *ব্রহ্মচর্য* শুরু হয়। জোহানিসবার্গে ভারতীয়দের জনসভায় ভাষণ

---

[২] B.R Nanda, Pictorial Biography of Mahtma Gandhi, p-75

Dhaka University Institutional Repository

দিলে তাঁর নেতৃত্বে শ্রোতৃবর্গ ট্রান্সভাল এশিয়াটিক আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স এর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অবলম্বনের শপথ গ্রহন করে।

গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ সেক্রেটারীর নিকট ভারতীয়দের ব্যাপারটি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য এ সময় ইংল্যান্ডে ডেপুটেশনে গমন করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সংগঠন করেন এবং জনগনের সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্য আইন ব্যবসায় ইস্তফা দেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার গান্ধীজীকে ট্র্যান্সভাল ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে তিনি সে নির্দেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে আপোস না হওয়ায় গান্ধীজী পুনরায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাকে দুই মাসের কারাদণ্ড দেন। গান্ধীজী নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ডেপুটেশন গান্ধীজী ইংল্যান্ডে গমন করেন এবং নভেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পথে জাহাজে তাঁর প্রথম জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কীয় বই 'হিন্দ স্বরাজ' গুজরাটি ভাষায় লিখেন। ''ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় মোটামুটি এইঃ (১) অস্ত্রবলে ইংরেজ ভারতবর্ষ দখল করেনি; মুখ্যতঃ ভারতীয়দের সাহায্যেই করিয়াছে। (২) দেশীয় সাহায্য হইতে ইংরেজ বঞ্চিত হইলে দেশে স্বরাজ লাভ সম্ভব। (৩) অহিংসার পথেই স্বরাজ লাভ সম্ভব, হিংসার পথে নয়। (৪) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আসল গণতন্ত্রের প্রতীক নয়। (৫) বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা ক্ষণস্থায়ী, ভারতীয় সভ্যতা শ্রেয়। (৬) আধুনিক সভ্যতার প্রতীক যন্ত্র, মানবের জন্য অকল্যাণকর। (৭) সত্যিকার স্বরাজ হইল নিজ শাসন বা আত্মসংযম। (৮) নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ উহার পথ অর্থাৎ আত্মার শক্তি বা প্রেমের শক্তি। (৯) এই শক্তিকে কাজে লাগাইতে হইলে সর্ব প্রকারে 'স্বদেশী' হইবার অব্যশ্যকতা আছে।''[৪] গান্ধীজী স্বদেশ ফেরার আগে সরকার এটা নিষিদ্ধ করেছিল। সারা জীবন যে নিষ্ক্রিয় অহিংস নীতি প্রচার ও অভ্যাস করেন সে বিপ্লবী দর্শনই এ বইতে উপস্থাপিত হয়। লিউতলস্তয়, রাসকিন, থরো এমারসন ও ভারতীয় দর্শনাচার্যদের চিন্তার প্রভাব এ গ্রন্থে বিদ্যমান।

গান্ধীভক্ত হেরমান কালেনবাক নামক এক জার্মান স্থপতি গান্ধীজীকে ট্রান্সভালে জোহানিসবার্গের নিকট ১,১০০ একর জমি প্রদান করেন। এ জমি দিয়ে গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের কর্মসংস্থানের জন্য 'তলস্তয়' নামক একটি খামার তৈরী করেন। ১৯১২

---

[৪] B.R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, p-130

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজী ইউরোপের পোষাক ও দুধ ব্যবহার পরিত্যাগ করে। এ সময় তিনি শুধু তাজা ফল খেয়ে জীবন ধারণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয়দের উপর মাথাপিছু ৩ পাউন্ড কর ধার্য রহিত করার অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে ইউনিয়ন সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী আবার সংগ্রাম শুরু করেন। ''এ সংগ্রামে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা ছিল ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন স্ত্রীলোক ও ৫৭ জন ছেলে মেয়ে। আন্দোলন করে এরা ট্রান্সভালে প্রবেশ করলে গান্ধীকে ৯ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।''[৫] এর পর আরো একবার তাঁকে ৩ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয় কিন্তু গান্ধী জামিনে মুক্তি পান। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন থাকা কালীন সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করেন এবং ব্রিটিশদের সহায়তা করেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ জানুয়ারী মাসে প্রায় ২১বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী স্থায়ীভাবে স্বদেশ ভূমি ভারতে ফিরে আসেন। 'এপেলো' জাহাজ বোম্বে বন্দরে ভিড়লে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়রা গান্ধীজীকে তখন তাদের নেতা হিসাবে স্বাগত জানান। 'এবছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য রাজার জন্মদিনে বৃটিশ সরকার তাঁকে 'কাইসার-ই-হিন্দ' স্বর্ণ পদক প্রদান করেন।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে *শান্তি নিকেতন*-এ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে গান্ধীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। কবিগুরু তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ প্রসঙ্গে হিরেন মুখার্জ্জী উল্লেখ করেন- "He was called "Mahatma at Kathiawad Reception in January, 1915, and in a letter dated February 1915 Rabindranath Tagore called him by that name."[6] 'মহাত্মা' শব্দের অর্থ মহান আত্মা। Great Soul.

এ বছরই মহাত্মা গান্ধী মে মাসে আহমেদাবাদে সবরমতি নদীর তীরে কোচরাব নামক স্থানে *সত্যাগ্রহ আশ্রম* স্থাপন করেন। তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে চড়ে সমস্ত উপমহাদেশ এবং বার্মা (মায়নামার) ভ্রমণ করে সাধারণ গণ মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হন। এ সময় ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোন উল্লেখ যোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহন করেননি।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে ভারত হতে চুক্তি বদ্ধ শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের বিরুদ্ধে গান্ধীজী আন্দোলন করেন ও সাফল্য লাভ করেন। এসময়ই সূতা কেটে হাতে বস্ত্র তৈরীর ধারণা

---

[৪] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৭৪
[৫] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৭৪
[6] Hiren Mukerjee, Gandhiji: A Study, p- 15

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত হন। এ বছর এপ্রিল মাসে বিহারের চম্পারণে নীল চাষাবাদে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধান করতে গিয়ে গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি পান। মূলতঃ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই গান্ধীজী সক্রিয়ভাবে ভারতীয় রাজনীতেতে প্রবেশ ও অগ্রযাত্রা শুরু করেন। গান্ধীজীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়ে যোগেশ চাধা তাঁর বইতে উল্লেখ করেন- 'The annual session of Congress was held at Amritsar in the last week of December. Gandhi himself considered his participation in its proceedings as his real entrance into congress politics. Jawaharlal Nehru referred to the Amritsar Congress as 'The first Gandhi Congress'."[7]

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আহমেদাবাদে বস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের পক্ষে তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন শুরু করেন এবং আপোষ মিটমাটের জন্য উপবাস অবলম্বন করেন। পরবর্তীতে বোম্বাই এর কায়রা জেলার শস্যহানীর দরুন খাজনা মওকুফের জন্য 'সত্যগ্রহ আন্দোলন' শুরু করেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ত্রাস মুলক কার্যকলাপ দমনের অভিপ্রায়ে বৃটিশ সরকার নির্বতনমুলক রাউলাট বিল প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। গান্ধীজী এর বিরোধীতা করে বিল বাতিল করানোর জন্য সত্যগ্রহ প্রতিজ্ঞায় দস্তখত সংগ্রহ করেন। বৃটিশ সরকার ২১শে মার্চ বিলটি পাশ করেন। বিলটি পাশ হলে এপ্রিল মাসে উপমহাদেশে সর্বভারতীয় সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরু হয় এবং ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল পালিত হয় এ বিলের বিরুদ্ধে।

রাউলাট বিল এর বিরোধীতা করে গান্ধীজী বলেন-''আমি বিবেক সম্মত ভাবেই এই মত পোষণ করি যে এ বিলের ধারা গুলি ন্যায়নীতির পরিপন্থী, স্বাধিকার ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক নীতিমালার পক্ষে অনিষ্টকর এবং মৌল মানবাধিকারের জন্য ধবংসাত্বক.....আমাদের দৃঢ় শপথ এই যে বিলটি যদি আইনে পরিণত করা হয় তা'হলে যে পর্যন্ত এ আইন প্রত্যাহার করা না হবে ততদিন আমরা একে সংযত ভাবে গ্রহণ করব না.....এ সংগ্রামে আমরা সত্যাশ্রয়ী থাকব এবং জীবন, ব্যক্তি ও সম্পত্তির উপর হামলা থেকে বিরত থাকব।''[৮] এ সর্ব ভারতীয় সত্যগ্রহ আন্দোলনের সময় পাঞ্জাব প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় দিল্লীর পথে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করে বোম্বে (মুম্বাই) ফিরিয়ে আনা হয়।

---

[7] Youesh Chandna, Rediscovering Gandhi, p-243
[৮] P.N Chopra: India's Major-Nonviolent Movements, 1919-1934, p-54

Dhaka University Institutional Repository

'অমৃতসর শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সমাগত প্রায় ৬ হাজার শিখ নারী পুরুষ ও শিশু পুণ্যার্থীদের উপর গ্যারিসন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রেজিল্যান্ড ডায়ার এর হুকুমে ১০মিনিট ধরে ১৬৫০ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। এর ফলে সাথে সাথে প্রায় ৬০০ শতাধিক নারী পুরুষ নিহত হয় এবং দেড় হাজারের বেশী গুরুতরভাবে আহত হয়।'[৯] প্রচার মাধ্যমের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকায় গান্ধীজীর কাছে প্রায় দেড় মাস পরে এ সংবাদ পৌঁছে। সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী *সবরমতি* আশ্রমের নিকট বক্তৃতা দেন এবং ৩ দিনের জন্য অনুশোচনা সূচক উপবাস ঘোষণা করেন। মহাত্মা গান্ধী এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিণতিতে সারা উপমহাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে এ আশংকায় তিনি আন্দোলন তুলে নেন এবং 'খাদি আন্দোলন' এ নিজেকে ব্যপৃত করেন।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী গুজরাটি ভাষায় মাসিক 'নব জীবন' পত্রিকা সম্পদনা শুরু করেন ও পরবর্তীতে হিন্দি ভাষাতে ইহা প্রচারিত হয়। একই বছর অক্টোবরে ইংরেজী ভাষায় সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ হতে শুরু করে। এ পত্রিকার মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, জীবন দর্শনের কথা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উপমহাদেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পান।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত খিলাফত কনফারেন্সে গান্ধীজী সভাপতিত্ব করেন। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার গ্রহণ করার জন্য তিনি কংগ্রেসকে পরামর্শ দেন। তুরস্কের সুলতানের খিলাফত রক্ষার জন্য ভাইসরয় এর নিকট ডেপুটেশনে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে নেতৃত্ব দেন। ''ভারতীয় মুসলমান নেতারা তুর্কী সামাজ্যের অখন্ডতা ও *খিলাফত* রক্ষার জন্য ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট হতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এটাই ইতিহাসে 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও তাঁর ভাই মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ এ আন্দালনের নেতৃত্ব দেন।''[১০]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, স্বরাজ অর্জনের পক্ষে দাবি আদায় ও ব্রিটিশ দমন নীতির প্রতিবাদে কোলকাতা কংগ্রেসে আন্দোলনের এক কার্যসূচী গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে 'খিলাফত' আন্দোলনের একই সময়ে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই

[৯] সৈয়দ মুর্তজা আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ- ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সেপ্টেম্বর থেকে মহাত্মা গান্ধীজী সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী এক পরিকল্পিত আন্দোলনের সূচনা করেন। এটি 'অসহযোগ আন্দোলন' নামে খ্যাত। অসহযোগ আন্দোলনকে খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী হিন্দু মুসলমানের মিলিত এক প্রবল আন্দোলনের গড়ে তোলেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ আন্দোলনের যুগ্ম নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত থাকে।

এ যুগ্ম আন্দোলনের প্রধান উদ্দ্যেশে ছিল অসহযোগের মাধ্যমে আচলাবস্থা সৃষ্টি করে খিলাফত রক্ষা ও স্বরাজ র্অজনের দাবী মেনে নিতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করা । হিন্দু মুসলমানের এ মিলিত আন্দোলন সারা উপমহাদেশ জুড়ে এক মহাশক্তিশালী গণআন্দোলনে পরিণত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন এ আন্দোলনের ফলে ভারতীয়রা স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে স্বদেশ প্রেমে এতই উজ্জীবিত হয়েছিল যে, অংশগ্রহনকারীরা স্বেচ্ছায় ব্রিটিশদের খেতাব ও চাকরি বর্জন করে, অফিস আদালত ত্যাগ করে ও বিলেতি পণ্য ব্যবহার পরিহার করে। অবশেষে সরকারের কর-খাজনা প্রদানও বন্ধ করে দেয়।

মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে ভাইসরয়ের নিকট 'কাইসার-ই-হিন্দ' পদক, 'যুলু' পদক ও 'বুর' যুদ্ধ পদক প্রত্যর্পণ করেন। এ সময় স্বরাজ তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয় এবং জাতীয় সংগঠন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ২০ লক্ষ চরকা ব্যবহারের কার্যসূচী গৃহীত হয়। বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে বর্জনের অভিযানে গান্ধীজী নেতৃত্ব দেন। উপমহাদেশ জুড়ে বিদেশী পণ্য পরিহারের ধুম পরে যায়। বোম্বেতে জনতা বিদেশী বস্ত্রের স্তূপের উপর অগ্নি সংযোগ করেন। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এ সময় উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির মিলন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে।

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর এ স্বরাজ আন্দোলন অহিংসার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নেয়। সমগ্র উপমহাদেশ ব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে জনতা সহিংস সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে।[১] ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী উত্তর ভারতের চৌরিচৌরা নামক স্থানে একদল উত্তেজিত জনতা একটি থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহী ও একজন দারগাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। চৌরিচৌরার সহিংসতার সংবাদে গান্ধীজী মর্মাহত হন ও অসহযোগ আদোলন তুলে নেন। এর সাথে সাথে খেলাফত আন্দোলনেরও অবসান ঘটে। .....এ

[১] সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, স্নাতক রাষ্ট্র বিজ্ঞান, পৃ-২৪

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের ফলে উপমহাদেশে এক অভূতপুর্ব গণজাগরণ আসে ফলে স্বাধিকার আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়।[১১]

চৌরিচৌরার সংহিসতার অনুশোচনা হিসেবে গান্ধীজী একাধিক্রমে ৫দিন উপবাস করেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ সবরমতি আশ্রম থেকে মহাত্মা গান্ধীকে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর ১৮ই মার্চ ৬ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীকে কারাগারে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফ্রেব্রুয়ারী ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে মুক্তি দেন। কারামুক্ত হয়ে হিন্দু মুসলমান একতার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১ দিন উপবাস করেন। এ বছরই ডিসেম্বর মাসে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী সভাপতিত্ব করেন । ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত সূতাকাটা সমিতি স্থাপন করেন ও নভেম্বর মাসে আশ্রমবাসী একজনের অপকর্মের জন্য নিজে স্বয়ং ৭দিন বদলী উপবাস করেন। এ সময়েই গান্ধীজী তার অত্মজীবনী মূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "The Story of My Experiment with Truth" এর রচনা শুরু করেন ।

১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস এর কোলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যে ১৯২৯ সালের মধ্যে ব্রিটিশ রাজ ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা না দিলে কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প হবে। এরপর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১সে ডিসেম্বর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় ঘোষিত হয় ''কংগ্রেসের নীতিতে 'স্বরাজ' অর্থ হবে 'পূর্ন স্বাধীনতা'। এ ঘোষণার মাধ্যমে কংগ্রেস আন্দোলনের পথ বেছে নেয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রয়ারী মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক গান্ধীজী 'আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience Movement)' এর এক নায়ক নিযুক্ত হন ।

এ দিকে ইংরেজ সরকার ভারতে লবণের উপর কর আরোপ করে। এতে গান্ধীজী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মার্চের শুরুতে গান্ধীজী ভাইসরয়কে লেখেন যে, কংগ্রেস এর দাবী গ্রহণ না করলে তিনি লবণ কর সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেবেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজীর কথায় কর্ণপাত না করলে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই মার্চ গান্ধী সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় লবণ কর সংক্রান্ত সরকারী আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। পরদিন ভোরবেলা সবরমতি আশ্রম থেকে প্রায় আড়াই হাজার মাইল দুরে অবস্থিত সমুদ্রগামী উপকূলবর্তী (আরব সাগর) ডাণ্ডি শহরের উদ্দ্যেশে মিছিল সহকারে যাত্রা শুরু করেন। এ মিছিল গান্ধীজীর 'সল্ট মার্চ'

[১১] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বা 'লবণ সত্যাগ্রহ' নামে খ্যাত। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল ডান্ডিতে পৌঁছে লবণ আইন ভঙ্গ করবেন। বস্তুতঃ ইংরেজ রাজশক্তির অপশাসনের প্রতিবাদে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে গান্ধী এ সল্ট মার্চকে একটি প্রতীকি আন্দোলন হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।''[১২]

মার্চ করে ৬ই এপ্রিল ডান্ডিতে পৌঁছে গান্ধীজী আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে যখন এক মুঠো নিষিদ্ধ লবণের চাকা সমুদ্র তীর থেকে উঠিয়ে সমবেত জনতার সামনে তুলে ধরেন তখন জনমনে স্বদেশ চেতনার এক প্রবল তরঙ্গ খেলে যায়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এ চেতনার তরঙ্গ সমস্ত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশী লবণ ব্যবহার ও বিদেশী পণ্য সামগ্রী পোড়ানোর ধুম লেগে যায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হয় প্রবল আইন অমান্য আন্দোলন। ৫ই মে গান্ধীজী গ্রেফতার হন। কারাগারে যাত্রার প্রক্কালে গান্ধীজী বলেনঃ "আমার গ্রেফতারের ব্যপারে আমার অনুসারী ও দেশবাসীদের বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই, কারণ এ আন্দোলন পরিচালনা করছেন স্বয়ং বিধাতা, আমি নই। বর্তমানে ভারতে আত্মমর্যাদার, বস্তুতঃ সব কিছুরই প্রতীক সত্যাগ্রহীর হাতে ধরা এক মুঠো লবণ। যে মুঠোয় এই লবণ ধরা আছে সে মুঠো ভেঙ্গে দেয়া হলেও কেউ যেন স্বেচ্ছায় লবণ মুঠো ছাড়া না করে।"[১৩]

গান্ধীজী গ্রেফতারের পরপরই ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষেরও অধিক লোক জেলে আটক করা হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ভারত উপমহাদেশে শুরু হয়ে যায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রচন্ড আন্দোলন ও সন্ত্রাস মূলক কার্যকলাপ। সীমান্ত গান্ধীর লাল কোর্তা বাহিনীর বিদ্রোহ, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রীর বুহৃৎসব বৃটিশ রাজশক্তিকে কাঁপিয়ে তোলে। এ সময় কংগ্রেস সদস্যরা কেন্দ্রীয়ও প্রাদেশিক আইন সভা ও অন্যান্য সরকারী সংস্থা বর্জন করেন। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে। পরে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজী বিনা শর্তে জেল হইতে মুক্তি পান। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে বড়লাট লর্ড অরউইনের সাথে গান্ধীজীর ৮বার সাক্ষাৎকার ঘটে। এর পর ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে 'গান্ধী-অরউইন চুক্তি' সই এর মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন এর প্রত্যাহার ঘটে ও গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে অংশ নিতে সম্মত হন।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বেঠকে অংশ গ্রহণের জন্য গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ২৯শে আগষ্ট বিলেত যাত্রা করেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান এ বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ৫ই ডিসেম্বর গান্ধী ইংল্যান্ড ত্যাগ করে স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ২৮শে ডিসেম্বর মোম্বাই বন্দরে পৌঁছলে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলে পাঠানো হয়।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট সম্প্রদায় ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি রেখে 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' প্রস্তাব ঘোষিত হয়। এ প্রস্তাব বলে বিভিন্ন

---

[১২] সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়ের মত হরিজনদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ইংরেজ সরকারের সম্প্রদায় ভিত্তিতে উপমহাদেশের সাধারণ জনগণকে পৃথক করার এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হন। সাম্প্রদায়িক ব্যাটোয়ারার প্রতিবাদ হিসাবে 'হরিজনদের' আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা রহিত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী জেলেই ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে 'আমরণ অনশন' শুরু করেন। শংকর ঘোষ লিখেন, In september 1932 from prison, Gandhi start an all India anti Untouchability League with his industrialist friend Birla as president and A.V Thakkar as secretary."[14] এ সময় হিন্দু ও অনুগত শ্রেণীর নেতারা গান্ধীর জীবন রক্ষা করতে উদ্যোগী হন। তারা গান্ধীজীর সাথে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তিতে পৌঁছান। এ চুক্তিটি 'পুনা চুক্তি' নামে পরিচিত। এতে বলা হয় অনুন্নতদের আসন সংরক্ষিত থাকবে তবে যৌথ এলাকায় অন্য হিন্দুদের সাথে তারা ভোট দেবে। ২৬শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার হরিজনদের সম্পর্কে তাঁর দাবী গ্রহণ করায় তিনি উপবাস ভঙ্গ করেন। কারাবাস কালেই গান্ধীজী 'হরিজন' নামে পত্রিকা স্থাপন করেন। এ পত্রিকাটি সরকারী অনুমতিতে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে।

৮ই মে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের দুপুর থেকে আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধীজী কারাগারে ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন। ঐ দিনই রাত্রি ৯ ঘটিকায় ব্রিটিশ সরকার বিনা শর্তে তাঁকে জেল হ'তে মুক্তি দেন। ৯ই মে গান্ধীজী ৬ সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়ে সরকারকে আইন অমান্য আন্দোলনের অর্ডিন্যান্স গুলো প্রত্যাহারের আহবান জানান। ২৯শে মে আত্মশুদ্ধির উপবাস ভঙ্গ করেন। ২৬শে জুলাই সত্যাগ্রহ আশ্রম তুলে দেন। ৩০শে জুলাই মোম্বাই সরকারকে জানান যে, তিনি ৩৩ জন অনুসারীকে নিয়ে আহম্মেদাবাদ হ'তে রাস পর্যন্ত মার্চ করে আইন অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করবেন। এ প্রেক্ষিতে ৩১শে জুলাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ও বিনা বিচারে জেলে পাঠানো হয়। ৪ঠা আগষ্ট জেল হতে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলেও অপর একটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ব্রতী হন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে সুযোগ না দেয়ার কারণে তিনি ১৬ই আগষ্ট থেকে জেলেই উপবাস শুরু করেন। পরে ২৩শে আগষ্ট বিনা শর্তে মহাত্মাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়েই ৭ই নভেম্বর তিনি হরিজন উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন।

১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, ১লা অক্টোবর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পল্লী শিল্পোন্নয়ন, হরিজন সেবা এবং মৌলিক হস্তশিল্প উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন। এ প্রেক্ষিতে ২৬শে অক্টোবর "নিখিল ভারত পল্লী শিল্প সমিতি" উদ্বোধন করেন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল থেকে মধ্য প্রদেশের ওয়ার্ধার নিকট সেবা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন এবং এটি তাহার কর্ম কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর ওয়ার্ধার

---

[14] Robert Payen, The Life and Death of Mahatma Gandhi,p-394
[15] Sankar Ghose, Mahatma Gandhi, p-231

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা সম্মেলনে কারুশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের স্কীম বর্ণনা করেন। রাজকোর্টের শাসন কর্তার শাসন সংস্কার বিষয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করানোর জন্য ১৯৩৯ সালের ৩রা মার্চ রাজকোর্টে 'আমরণ উপবাস' শুরু করেন। পরে ৭ই মার্চ ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে গান্ধীজীর উপবাস ভঙ্গ হয়।

যুদ্ধপরিস্থিতির আলোচনার নিমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর অক্টোবর মাসে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন চালানোর নীতি মঞ্জুর করেন। সত্যাগ্রহ সংক্রান্ত সরকারী প্রাক সেন্সরের কারণে গান্ধীজীর হরিজন ও আন্যান্য পত্রিকার প্রকাশণা এ সময় স্থগিত হয়। গান্ধীজীর নিজের অনুরোধে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি তাঁকে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের নেতৃত্ব হ'তে রেহাই দেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী থেকে হরিজন সহ সকল বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকা গুলো তিনি আবার প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশ সরকার হতে শাসন সংস্কার মূলক প্রস্তাবাবলী নিয়ে ভারতে আসেন যা "ক্রিপস মিশন" নামে খ্যাত। মুসলিমলীগ নেতারা এ প্রস্তাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও স্পষ্টভাবে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির কথা না থাকায় এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেন। গান্ধীজী ২৭শে মার্চ নয়াদিল্লীতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবাবলী শুনে ক্রিপসকে প্রথমে প্লেনে চড়ে দেশে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। ক্রিপস মিশন ব্যর্থতার পর মে মাসে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগষ্ট মোম্বাইতে কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বৃটিশদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে 'ভারত ত্যাগ' বা 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন। এর পরপরই গান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত উপমহাদেশে অহিংস পথে ব্যপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। এ কারণে ৯ই আগষ্ট গ্রেফতার হয়ে গান্ধীজী পুনাতে অবস্থিত আগাখান প্রাসাদে বন্ধী হন। গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার ও ভাইসরয়ের সাথে গান্ধীজীর সাথে রাজনৈতিক গোলযোগের বিষয়ে পত্র বিনিময় হয়। রাজনৈতিক সমস্যার প্রেক্ষিতে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে গান্ধীজী ২১ দিনের উপবাস শুরু করে ৩রা মার্চ ভঙ্গ করেন।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে বন্ধী থাকাকালীন সময়েই আগাখান প্রসাদে ২২শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর পত্নী 'কস্তুরীবাঈ' মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই ৬ই মে তারিখে তাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হয়। কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি রাজা গোপালাচারীর মধ্যস্থতায় সেপ্টেম্বর ৯ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত পাকিস্তান স্থাপনের দাবী সংক্রান্ত বিষয়ে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও গান্ধীজীর মধ্যে আলোচনা হয়। কিন্তু তাদের মধ্যকার মৌলিক মতপার্থক্য নিরসন হয়নি। গান্ধীজী চান ভারতকে অখন্ড রাখতে আর জিন্নাহ্ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির দাবী জানান। গান্ধীজী ১৯৪৫ সনে জানুয়ারী-ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশ ও আসাম এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হিন্দুস্থানী প্রচার কার্য চালান। এ বছরই ১০ই ফেব্রুয়ারী হ'তে আগাখান প্রাসাদে বন্ধী হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকাগুলো পুনঃ প্রকাশ শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, লর্ড পেথিক লরেন্স ও এ. ভি. আলেকজান্ডার এ তিনজন মন্ত্রী সমন্বয়ে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি মিশন ভারতে পাঠায় যা 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা'(Cabinet Mission Plan) নামে পরিচিত। এপ্রিলে দিল্লী ও মে মাসে সিমলায় গান্ধীজী মন্ত্রী মিশনের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় মিলিত হন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। জুলাই মাসে ভাইসরয় কর্তৃক আহুত দলীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে তিনি পর্যবেক্ষক রূপে উপস্থিত থাকেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direction Action Day)'এর প্রেক্ষিতে কলকাতায় শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এরপর বিহার প্রদেশ ও পূর্ব বঙ্গের নোয়াখালী জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। গান্ধীজী অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে আসেন ও নোয়াখালীতে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে ১৯৪৭ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত সম্প্রীতি ও দাঙ্গা থামাতে নোয়াখালীতে অবস্থান করেন। নোয়াখালীর দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বিহারে দাঙ্গা বাঁধলে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে বিহারের দাঙ্গা বিধস্ত অঞ্চলে যান শান্তির মিশন নিয়ে।

নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের সাথে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুন এক পরিকল্পনা করেন যাকে '৩রা জনু পরিকল্পনা' বা 'লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা' বলা হয়। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহতা, কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনৈক্য দেখে ভারত বিভাগ করে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দু'টো সার্বভৌম রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয় এ পরিকল্পনায়।

ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পাকিস্তান দাবী প্রকট হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক সভা হয়। সভায় দেশ বিভাগের সরকারী প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ একটি প্রস্তাব উথাপন করেন। কংগ্রেস কখনও দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন না। ফলে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠে। মীমাংসার জন্য তাই এ বিতর্কে গান্ধীজীর হস্তক্ষেপ জরুরী হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' উল্লেখ করেন, "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে সমর্থন জানানোর জন্য তিনি সদস্যদের প্রতি আবেদন জানালেন। গান্ধীজী আরও বললেন যে, তিনি সব সময়ই দেশ বিভাগের বিরোধী ছিলেন, কেউ এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, আর কোন বিকল্প পথ নেই। রাজনৈতিক বাস্তবতাই মাউন্ট ব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে এবং তিনি পন্ডিত পন্থ উথাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচেছন।"[১৫] প্রস্তাবটি পক্ষে ২৯ ও বিপক্ষে ১৫ ভোটে গৃহীত হয়। ৩রা জুন পরিকল্পনা অনুসারে ভারত স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাই মাসে বিধিবদ্ধ করা হয়। এ আইনের বলে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭

[১৫] মওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৪৬-২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট 'পাকিস্তান' ও ১৫ই আগষ্ট 'ভারত' স্বাধীনতা লাভ করে। উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সাথে সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যবনিকাপাত ঘটে।

পাক ভারতের স্বাধীনতা তথা দেশ বিভাগের দিন মহাত্মা গান্ধী কোলকাতায় অবস্থান করেন; উদ্দেশ্য দাঙ্গা প্রতিরোধ। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও দ্বিধা বিভক্ত উপমহাদেশের অনেক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। গান্ধীজী দাঙ্গা থামাতে অনশন করেন ফলে মানুষের মধ্যে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হয় এবং দাঙ্গা থেমে যায়। দেশ ভাগের পর পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তৈরী হয় চরম বৈরী মনোভাব।"গান্ধীজী পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের বৈরী মনোভাব বিদূরণ এবং তাদের পাওনা পরিশোধের জন্য উপবাস শুরু করেন। এর ফলে ভারত সরকার পাকিস্তানে প্রাপ্য অর্থের কতকাংশ মিটাইয়া দেয়।"[১৬]

যদিও ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে একবারই মাত্র গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতি হন কিন্তু তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের ছায়াতলে কংগ্রেসের ও উপমহাদেশের জাতীয় রাজনীতির যে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রী বৃদ্ধি ঘটেছিল তা মহামূল্য সম্পদ। গান্ধীজীর সাথে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অনেক ক্ষেত্রে মতের অমিল ছিল কিন্তু তিনি গান্ধীজী প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে উল্লখ করেন, "The role which a man plays in history depends partly on his physical and mental equipments, and partly on the environment and the needs of times in which he is born. There is some thing in Mahatma Gandhi, which appeals to the mass of the Indian people."[১৭] এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রজনী দাস দত্ত "ইন্ডিয়া টুডে" গ্রন্থের ২য় সংস্করণে গান্ধজী সম্পর্কে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য মূল্যায়ণ করেছেন, "গান্ধীজী সংকীর্ণ পরিবেশ হইতে জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন চালিত করিয়াছেন। অত্যন্ত অনগ্রসর ও নিষ্ক্রিয় জনগণকে তিনি জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।"[১৮]

---

[১৬] তোফাজ্জেল আহমদ, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৭৭

[১৭] Subhas Chandra Bose, The Indian Struggle, p-293

[১৮] মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও রাজনীতি, অধ্যায়-২৮, পৃ-৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গান্ধী চিন্তা ও নীতি

গান্ধীচিন্তার উৎসঃ

মাহাত্মা গান্ধী ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক, অহিংসবাদী নেতা। তিনি আজীবন সত্যকে জীবনের ব্রত এবং অহিংসাকে সমস্যা সমাধানের বড় পন্থা বলে নিজের জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গেছেন। এ কারণেই সুব্রত মুখার্জী ও সুশীলা রাম স্বামী লিখেছেন,"Mohondas Karamchand Gandhi was one of the great activist theoreticians of the twentieth century.[১] মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পিতামাতা উভয়েই আচার নিষ্ঠ হিন্দু। তাঁর পিতা ছিলেন নীতিবান, বিচক্ষণ, সত্যানুরাগী, সাহসীও উদার মানুষ। তিনি কখন ও দুর্নীতি ও ঘুষের ছায়াও মাড়াতেন না। তাঁর কাছে যে ন্যায় বিচার পাওয়া যেত পরিবারের সকলে তা জানতেন এবং বাহিরেও এ বিষয়টি ছড়িয়ে পরেছিল। গান্ধীজী নিজেই উল্লেখ করেন, "ধন সঞ্চয় করার লোভ পিতা ঠাকুরের কখনও ছিল না। সেই জন্যই তিনি আমাদের জন্য খুব কম ধন সম্পত্তিই রাখিয়া গিয়াছেন।"[২]

গান্ধীর মাতা পুতুলী বাঈ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু, সতী সাধ্বী মহিলা। পূজা পাঠ না করে তিনি কখনও আহার স্পর্শ করতেন না। তিনি ছিলেন 'প্রণামী' বা 'প্রাণনাথী' সম্প্রদায়ের অনুগামী। "এই সম্প্রদায় সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে বা মিশ্রণে বিশ্বাসী ছিল বলে তাদের মন্দিরে সকল ধর্ম গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। এমনকি পোর বন্দরের প্রাণনাথী মন্দিরের দেয়ালে কোরাণের আয়াত উৎকীর্ণ ছিল।"[৩] "তিনি প্রতিদিন বৈষ্ণব মন্দিরে যাইতেন। আমার জ্ঞান হওয়ার পরে তিনি কখনও '*চতুর্মাস্য ব্রত*' ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি খুব কঠোর ব্রতগুলিও পালন করিতে আরম্ভ করিতেন ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপন করিতেন। যে ব্রত লইতেন পীড়িত হইয়া পড়িলেও তাহা ত্যাগ করিতেন না।

গান্ধীজী বলেন, "আমার একবারকার কথা মনে আছে তিনি 'চান্দ্রায়ন ব্রত' লইয়াছিলেন, তারপর অসুস্থ হন, তবুও ব্রত ভঙ্গ করেন নাই। চতুর্মাস্য ব্রতের একবেলা আহার তিনি সহজেই পালন করিতেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একবার তিনি একদিন অন্তর একদিন ঐ ব্রতে উপবাস করিয়াছিলেন। পরপর দুই তিনটা উপবাস করাতো তার কাছে কিছুই ছিলনা। একবার চাতুর্মাস্যের সময় তিনি সংকল্প লইয়াছিলেন যে, সূর্য্য নারায়ণ দর্শন না করিয়া আহার করিবেন না। এই চার মাস আমারা (ছেলেরা) আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম যে, কখন সূর্য্য দেখা দিবে আর কখন মা

---

[১] Subrata Mukherjee and Sushila Ramswamy, Facts of Mahtma Gandhi: Political Idea (2), p-xv

[২] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৮৯

[৩] সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-৯০

আহার করিবেন। এই চার মাস অনেক সময়েই সূর্য্যের দেখা পাওয়া যে দূর্ঘট ইহা সকলেই জানেন। একদিন আমার মনে আছে সূর্য্য দেখিয়া আমি "মা মা সূর্য দেখা দিয়াছে" বলিয়া উঠিলাম, আর মা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতেই সূর্য মেঘের নীচে পালাইয়া গেল। "উহাতে কি হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, আমি খাই" বলিয়া তিনি ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। মায়ের ব্যবহারিক জ্ঞান খুব ছিল। দরবারের সকল খবরাখবর তিনি রাখিতেন এবং রাণীরা তাহার বুদ্ধির প্রসংশাও করিতেন।"[৪] বালক মহাত্মা গান্ধী মায়ের কাছাকাছি বেশী থাকতেন। উত্তরাধিকার সূত্রেই অসম্প্রদায়িকতা, অহিংসা ও সত্যবাদীতার বিষয়টি তার পিতা ছাড়াও মায়ের ধর্মদর্শন থেকেই গান্ধী অধিক হারে পেয়েছিলেন। মায়ের সাথে বেড়ে উঠার ঘটনা থেকে এটা সহজেই অনুমেয়।

মহাত্মা গান্ধী ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে বাগদত্তা হয়ে হাই স্কুলে পাঠকালীন সময়ে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে কস্তুরী বাঈকে বিবাহ করেন। রাজকোট হাই স্কুল হতে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কয়েক মাস ভবনগর সমলদাস কলেজে পড়ার পর ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে বিলেত গমন করেন। বিলাতে থাকাকালীন সময়ে সংস্কৃত, ল্যাটিন, ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করেন। বিলাতে পাড়াকালীন সময় তার জীবন ছিল খুবই সাদামাটা তিনি মায়ের কথা মত নিষিদ্ধ খাবার এবং মদ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন এবং নিরামিশ ভোজন করেন। বিলেতে আইন পড়ার সময় তিনি নিয়মিত 'গীতা' পাঠ করতেন এবং এর পাশাপাশি বৌদ্ধ, জৈন ও পার্সীদের ধর্মশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করেন। "গান্ধীজীর ইংল্যান্ড বাসের জীবন যেন প্রস্তুতির জীবন; যে প্রস্তুতির অন্তে শুরু হয় তার কর্ম জীবন। দক্ষিণ আফ্রিকা থাকাকালীন সাদা চামড়ার মানুষদের কালো চামড়ার মানুষদের প্রতি অবমাননার প্রতিকারের মধ্যদিয়ে সেই কর্মজীবন প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়। তারপর ভারত বর্ষে ফিরে এসে শুরু করেন স্বাধীনতা সংগ্রাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে থাকাকালীন অবসর সময়ে গান্ধী বাইবেল ও কুরআন সহ অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ণ করেন। শংকর ঘোষ এ প্রসঙ্গে লিখেন- " Gandhi continueed his study of all religions. He read Sale's translation of Koran and Washingtion Irvings life of Mohammed and his successors as also the saying of Zarathustra"[৫] এ সময় তিনি হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনাদর্শের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি লিউ তলস্তয়ের 'The Kingdom of God is Within You' (ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে রহিয়াছে) এবং ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে রাসকিন রচিত 'Unto the Last' পড়িয়া অভিভূত হন। দানবীর ও সত্যনিষ্ঠ *রাজা হরিশ্চন্দ্র* এর চরিত্র মহাত্মা গান্ধীকে প্রভাবিত করে।[৬] হরিশ্চন্দ্র সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন, "Why should not all be truthfull like Harishandra? was the question I asked my self day and night. To

[৪] তোফায়েল আহমদ, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৮৯

[৭] Sankar Ghose, Mahatma Gandhi, p-37

Subrata Mukherjee and Sushila Ramswamy, Facts of Mahatma Gandhi: Political Idea(2), p-75

Dhaka University Institutional Repository

follow truth and go through all the ordeals Harishandra ..... I thought of it all often made me wee."[৭]

Thoreau এর লেখা Notion of civil disobedience বইটি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। বোম্বের *রাজচন্দ্র* গান্ধীজীকে ধর্মীয় আধ্যাতিকতায় সম্পৃক্ত করে। রাজচন্দ্র সম্পর্কে গান্ধী বলেন- "During the two years I remained in close contact with him. I left in him every moment the spirit of *Vairagya* (renunciation)..... One rare feature of his writings is that he always set down what he felt in his own experience. There is in them no trace of unreality... I never saw him being tempted by objects if pleasure or luxury in this world. There was a strange power in his eyes; they were extremely bright and free from any sign of impatience or anxiety. They be spoke of single-minded attention..... These qualities can exist only in a man of self-control."[৮]

রাজচন্দ্রকে গান্ধীজী রাজচন্দ্র ভাই বলে সম্বোধন করতেন ও তাঁকে গুরু মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে রাঘবন আইয়ার উল্লেখ করেন,"Rajchandra who had given a sense of direction to Gandhi's religious quest of particular importance was Rajchandra's insistence on accord between belief and action; it was the way a man lived, not the recital of verse or the form of a prayer, which made him a good Hindu, a good Muslim or a Good Christian..... He regarded different faiths "like so many walled enclosures" in which men and women confined themselves. He was always bored by religious controversy and rarely engaged himself in it. He would study and understand the excellence of each faith and explain it to the followers of that faith."[৯] এ বিষয়ে বি. আর নন্দ আরো উল্লেখ করেন যে, "যে তিনজন ভারতীয় আধুনিক মানুষ গান্ধীজীকে প্রভাবিত করেছে তাঁদের মধ্যে রাজচন্দ্র একজন। গান্ধী তাঁর গুনাবলী সমুহ নিজে গ্রহণ করেছেন এবং এ প্রতিদান কোন দিন ভুলতে পারনে না।"[১০] *গোপাল কৃষ্ণ গোখলের* চিন্তা দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হন এবং গোখলে সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন-"Gokhale was like the Ganges which `Invited one to its bloosm of all the Indians he encountered."[১১]

---

[৭] Yogesh Chadha, Rediscovering Gandhi,p- 9,10
[৮] Raghavan Iyer,The Moral and Political writings of Mahatma Gandhi, Vol. I, p-145-46 (London,1986)
[৯] Raghavan Iyer. The Moral and Political writings of Mahatma Gandhi, Vol. I, p-152
[১০] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-129
[১১] Yogesh Chadha, Rediscovering Gandhi,p-73

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজী লন্ডনে আইন বিষয়ে পড়তে যাওয়ার এক বছর পর.....some English Theosophist friends invited him to read Sir Edwin Arnold's Song Celestial, it was with some embarrassment that he confessed that he had never read the Bhagvad Gita in Sanskrit or even in Gujarati. He also came across another book of Sir Edwin's. 'The Light of Asia, which told the story of Buddha's life renunciation and teachings. It was in England too that a fellow vegetarian entnusiast introduced young Gandhi to the Bible. The new testament, particularly the sermon on the mount, went straigth to his heart.[১২]

পবিত্র ভগবদ্গীতা থেকে তিনি আসক্তি বর্জন, বস্তুগত সম্পদ ত্যাগ এবং অহিংসার শিক্ষালাভ করেন। তিনি উল্লেখ্য করেন-"That the central teaching of the Gita is not *himsa* but *ahimsa* is amply demonstrated by the subject begain in the second chapter and summarized in the Concluding eighteenth chapter. The treatment in the other chapter also supports the position."[১৩] he called his "Spiritual Dictionary" was the Bhagavad Gita."[১৪]

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম সবসময়ই অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে মনে করে যা পাঠ করে গান্ধী অহিংসবাদে সম্পৃক্ত হন। অমাতেন্দু গুহ উল্লেখ করেন, "Jainism is a Hindu version religion. Which in its doctrine, accepted the 'Ahimsa' or Non-violence, as its assence."[15] তলস্তয় লিখিত 'The Kingdom of God is within you' গ্রন্থ পাঠ করে বিভিন্ন ধর্ম মধ্যকার পরস্পর বিরোধিতার স্বরূপ উদঘাটনে সক্ষম হন। Tostoy's faith in love and teachings of the sermon on the mount[১৬] মহাত্মা গান্ধীকে অনুপ্রাণীত করে; ফলে তিনি অসম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ব ধর্মে বিশ্বাসের প্রেরণা পান। ফলে গান্ধীজী সকল ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করে জাতীয় জীবনে সেকুলার গণতন্ত্রের কথা বলেছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ পড়ে গান্ধীজীর এ উপলব্ধি আসে যে, স্রষ্টাই পরম সত্য এবং সত্যই মানব মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং সত্যই মানব জাতীর একমাত্র লক্ষ্য ও আরাধ্য হওয়া উচিত।

Johan Ruskin এর Unto the last বইটি পাঠ করে গান্ধী ধারণা লাভ করেন যে সম্পদ ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার মাত্র বরং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যারা জীবন ধারণ করে তাদের জীবনই সার্থক। এ বিষয়ে গান্ধীর কথা সচ্চিদান্দ সিনহা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "God created

---

[১২] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-128
[১৩] Sarma D.S, The Father of Nation, The life and teaching of Mahatma Gandhi, p-76
[১৪] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-130
[১৫] Amatendu Guha, Concept of the philosophy of peace. Gandhi Prasang, October,2002, Vol-V,
[১৬] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-xviii

Dhaka University Institutional Repository

man to work for food and said that those who ate without work were thieves."[১৭] বি.আর নন্দ লেখেন,"Ruskin's principle inspired Gandhi to work out the basis of his concept of 'bread labour 'and of making community organization responsible for the welfare of the labourer.....Ruskin's ideas on political economy was the bedrock of the economic principles of Gandhi's ashram organization.[১৮] Ruskin's Unto The Last had brought home to him the value of a life of simplicity and the dignity of manual labour."[১৯]

গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের নিকট থেকে তিনি আধ্যাতিকতা সম্পৃক্ত রাজনীতির (Spiritualising Politics) ধরণা প্রাপ্ত হন। সর্বোপরি Theoreau's notion of civil disobedience গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণা প্রকাশের প্রেরণা যোগায়। Following Thoreau, Gandhi advocated emancipation of man from the out side bondage, from the self imposed imprisonment which he terms as civilization for it had diseased the mind and soul of the modern man.[২০] লিউ তলস্তয় যিনি ছিলেন যুদ্ধ ও বিপ্লবী বিরুধী; গান্ধীজী তাঁর চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্পর্কে মতামত উপস্থাপন করেন। এছাড়াও রাসকিন, থরো, এমার্সন ও ভারতীয় দর্শনার্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি রচনা করেন "হিন্দ স্বরাজ।" যেখানে তিনি অহিংসা আত্মসংযম ,সত্যাগ্রহ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অর্থাৎ আত্মার শক্তি , ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্টত্ব, যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের জন্য অকল্যাণকর ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

গান্ধী চিন্তাঃ

তিনি ছিলেন Practical Idealist; সত্য নিষ্ঠ, অহিংসার মাধ্যমে সেবার ব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করাই তার জীবনের মোক্ষ। বোধ করি এ কারণেই মহাত্মা গান্ধী বৌদ্ধর্ধমের "মজ্ঝিম নিকায়" অর্থাৎ মধ্যপথ কে সকলের সাথে সম্প্রীতির উপায় হিসেবে বেছ নেন। কেননা মধ্যপথই পক্ষ পাতিত্বহীন নিরপেক্ষতার জন্য এবং সকল শ্রেণীর সম মূল্যায়ণের জন্য উত্তম। এরিস্টেটলের Golden Mean এর মত গান্ধীও তাই মধ্যপন্থাকে আর্দশ বিবেচনা করতেন।[২১] গান্ধী দর্শনের ভিত্তি হচেছ-

---

[১৭] Schichidanand Sinha, The Unarmed Prophet,p-108
[১৮] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-xviii
[১৯] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-130
[২০] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-xviii
[২১] সুবোধ ঘোষ, অমৃতপথযাত্রী, পৃ- III

Dhaka University Institutional Repository

1. A passionate belife in the divine rule, and governance of the world. 2. An Implicit faith in the oneness of all life. 3. An optimistic view of the progress of man on earth as a spiritual being. 4. A preference of individuals to institutions as vehicles of moral and social action. 5. An absolute confidence in the efficiency of non-violence under all conditions and in all departments of life.[২২] উল্লেখিত দর্শনের নিরীক্ষেই গড়ে উঠেছে তাঁর ধর্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিশ্বচিন্তা।

ধর্মঃ

গান্ধীজী মনে করতেন ধর্ম মানুষের ক্রিয়া কর্মের নৈতিক ভিত্তি, কাজেই জীবন থেকে ধর্ম বাদ দিলে সে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজেকে বলেন- "আমি হিন্দু, আমি খৃস্টান, আমি মুসলিম, আমি ইহুদী, আমি শিখ, আমি বৌদ্ধ, আমি জৈন, আমি পার্সী। এক কথায় তাঁর ধর্ম হলো "মানুষ ধর্ম" Religion of Man.

গান্ধীজীর ধর্ম চিন্তা প্রসঙ্গে লুইস ফিশার লিখেন- "In 1942 when I was Gandhi's House guest for a week, there was only one decoration on the mad walls of his hut; a black and white print of Jesus Christ with the inscription. ' He is our Peace. I asked Ghandhi about it. I am a christian, he replied I am a christian and a Hindu and a Muslem, and a Jew."[২৩] গান্ধীজীর কাছে সত্যই ঈশ্বর। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের আইন ভিন্ন নয়। In the suprime reality of God, the unity of all life and the value of *ahimsa* (love) as a means of realizing God.[২৪] এ প্রসঙ্গে বি. পাত্তাভাই ও সীতারামাইয়া উল্লেখ করেন,"He belives in an all pervanding God, a God who is above all and beyond all, but he is a God who is "even the atheism of the atheist". His God is truth (sat) his truth is knowledge (Chit) and where there is knowledge there is bliss (anand). It is thus that he knows his God as *Sat-Chit-Ananda*."[২৫]

গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কখন তিনি সকল ধর্ম বিষয়ে অধ্যায়ণ করেন। তিনি দেখতে পান সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যতান বিদ্যমান। এই সকল ধর্মের একতা মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। Gandhi's advocacy of mutual toleration and respect between different religions originally arose from his study of comparative

---

[২২] D. S Sarma, The Father of Nation, p- 76
[২৩] Louis Fischer, The Life of Mahatma Gandhi, p- 333
[২৪] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-134

Dhaka University Institutional Repository

religion, but it had a practical aspect too. All his adult life he was leading struggles against racial, social and political injustice and his adherents in these struggles belonged to all the major religion.[২৬]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে সাপ্তাহিক "Indian Opinion" পত্রিকার আগস্ট সংখ্যায় এক নিবন্ধে তিনি তাঁর ধর্ম চিন্তা সম্পর্কে ঘোষণা দেন যে,"The time has passed when the Follows; of one religion could " Stand and say, Ours is the only true religion and all others are fales." For the next four (deeds; Gandhi Continued to emphasize the need for co-existence and tolerance between adherents of different faiths. The various religions were " as so many leaves of a tree"; they might seem different but " at the trunk they were one. " God, Allah, Rama, Narayan, Ishwar, Khuda were descriptions of the same Being. Gandhi quoted the saint narasimha;" The different shapes into which gold was beaten gave riseto different names and forms; but ultimately it was all gold. God's grace and revelation were not the monopoly of any race or nation; they descended equally upon all who waited upon God. No religion was, " absolutely perfect. All are equally imperfect or more or less perfect"[২৭] গান্ধী সকল ধর্ম থেকে সত্য ও বাস্তব উপাদান আহরণ করে নিজের জীবনে ও কর্মে ব্যবহার করেছেন। প্রত্যেক ধর্ম ভিন্ন পথে এক লক্ষ্যে পৌঁচেছে কাজেই পথে কি আসে যায়, যত মত তত ধর্ম। তিনি সেই ধর্মে বিশ্বাসী যা কুসংস্কারমুক্ত ও বিশ্বজনীন। বলা হয়ে থাকে যে,"He was a search for a new Yugadhrama, a moral code specific for his own age."[২৮]

মহাত্মা গান্ধী 'প্রার্থনা' (Prayer) অর্থের নতুন মাত্রা যোগ করেন। তিনি বলেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক এক মাত্র প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গতানুগতিক প্রার্থনা হচেছ আত্ম শুদ্ধিকরণ সাধারণ অর্থে প্রতিদিন স্নান করার মত। মনীব এবং কর্মচারীর মধ্যে যে সম্পর্ক সেরকম ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। সর্বদা এ চিন্তাই ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের বড় সেতু যা স্বাভাবিক প্রার্থনায় নাই। 'আমি' বোধ দূর করে নিজেকে অহংকার মুক্ত বিনয়ী করে শূন্য করে ফেলা এবং সবকিছুতে ঈশ্বর বিরাজমান চিন্তা, ঈশ্বর দূরে নয় নিকটে আছেন মনে করে তাতে আত্মসমর্পণ করাই ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পথ। এ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন-"Since

---

[২৬] B. Pattabhi & Sitaramayya, Gandhi and Gandhism Vol-1, p-19
[২৭] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-138
[২৮] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-138

Dhaka University Institutional Repository

divinity pervaded every one and every thing, when he prayed, he was not begging or demanding some thing from God but from himself, "my higher self, real self with which I have not yet achieved complete identification."[২৯]

গান্ধী ছিলেন ধর্মান্তরের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি কাউকে ও স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলতেন না; এটাকে তিনি ভীষণ ঘৃণা করতেন। গান্ধীর মত ছিল-"We have in the Ashram today several faiths represented. No proselytizing is practiced or permitted. We recognize that all these faith a are true and divinely inspired all have suffered through the necessarily imperfect handling of imperfect men."[৩০] জগতের সকল ধর্মের অনুশাসন গ্রহণের স্থান তাঁর ধর্ম বিশ্বাসে আছে। Gandhian religion was simply an ethical framework for the conduct of daily life. তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিষ্যা মিস স্লেড ছিলেন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী কিন্তু তিনি কখনও তাঁকে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেননি বরং ভারতীয় নাম 'মীরা' বলে ডাকতেন। গ্রেগ রিচার্ড খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী, যিনি গান্ধীজির আশ্রমে থেকে অহিংসা সম্পর্কে লিখতেন তাঁকে ভারতীয় নামে 'গবিন্দ' বলে ডাকা হতো তিনিও স্বধর্ম ত্যাগ করেননি।

গান্ধীজী সব সময় একটি থলেতে শ্রীমদ্ভগবদগীতা, আল-কোরাণ, বাইবেল, The practice and preccpts of Jesus and Jewish Thought প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থ রাখতেন। তাঁর সভার শুরুতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হতো। মহাত্মা বলতেন- হিন্দুকে ভাল হিন্দু, মসলমানকে ভাল মুসলমান, খ্রীষ্টানকে ভাল খ্রীস্টান, পার্শীকে ভাল পার্শীতে পরিণত করাই তাঁর উদ্দেশ্য।

রাজনীতিঃ

গান্ধীজি রাজনীতিকে দেখেছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে। তাঁর বিশ্বাস ধর্ম মানুষের ক্রিয়া কর্মের নৈতিক ভিত্তি কাজেই জীবন থেকে ধর্ম বাদ দিলে সে জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তিনি রাজনীতি ও ধর্মকে বিচ্ছিন্ন মনে করেননি কারণ, তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল অহিংসা ও মানব সেবা। যেহেতু অহিংসা ও মানব কল্যাণ ধর্মেরও বড় নিয়ামক অতএব ধর্ম ও রাজনীতি বিচ্ছিন্ন নয়।

গান্ধী ধর্মকে রাজনীতির সাথে মিশিয়ে ফেলছে এ নিয়ে ব্রিটিশ সাময়িকীতে সমালোচনা হলে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে জবাবে মহাত্মা গান্ধী লিখেন- "Let me explain what I mean by

---

[২৯] Antony Copley, Gandhi's Secularism Reconsidered, p-375
[৩০] Edt. Mahatama Gandhi, Weekly Harijan, 19 August, 1939
[৩১] Edt. B R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-139

Dhaka University Institutional Repository

religion. It is not the Hindu religion, which I certainly prize above all other religions, but the religion which transcends Hindusim which changes one's very nature, which bibds one indissolubly to the truth within and whichever purifies. It is the permanent element in human nature which counts no cost too great in order to find full expression and which leaves the soul utterly restless until it has found itself, know its maker and appreicated the true correspondence between the maker and itself."[৩১]

গান্ধীজির রাজনীতি হচ্ছে আধ্যাতিক রাজনীতি (Spiritual Politics)। ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কবল থেকে বিশ্ব মানবতাকে মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক মঞ্চে আরোহন করেন। রাজনীতি সম্পর্কে অনেকের ধারণা হচ্ছে- Politics is considered a game in which expediency must take precedence over morality. গান্ধীজীর সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব তিলক ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে গান্ধীজীকে বলেন, "সাধুদের জন্য রাজনীতি নয়"। গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা কিন্তু গতানুগতিক ছিল না। He did not and could not accept the commonly accepted view of politics, because satyagraha, the mode of struggle he had evolved for fighting against social and political oppression, was rooted in morality. It excluded untruth, secrecy and hatred; it eschewed violence; it invited suffering at the hands of the oppressor instead of inflicting it on him, and it presumed that it was possible to convert the enemy of today into afriend of tomorrow.[৩২]

গান্ধীজীর অহিংসবাদী ধর্মবিশ্বাস সম্পৃক্ত রাজনীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। একই সাথে বিশ্ব রাজনীতিতে সেকুলারিজমের ধারণাকেও বদলে দেয়। তাঁর ধারণার সেকুলারিজম হলো-"The most Indian secular means non-communal or non-sectarian, but it does not mean non religious. For most, the basis of the secular state is not a 'wall of separation' between state and religion, but rather the 'no-preference doctrine' 'which requires only that no special privileges be granted to any one religion."[৩৩]

মহাত্মা গান্ধীর সেই ধর্মে বিশ্বাস ছিল যা কুসংস্কারমুক্ত এবং বিশ্বজনীন ও অহিংস। এ কারনে তিনি ধর্মকে রাজনীতির উৎস বলেন। তিনি উল্লেখ করেন-"Politics bereft of religion are

---

[৩১] Etd.B. R Nanda, Mahatma Gandhi-125 Years,
Gandhi's Secularism Reconsidered-Antony Copley ,p-379
[৩২] Edt.B.R Nanda, Mahatma Gandhi 125 Years, Gandhi and Religion, p-142

Dhaka University Institutional Repository

adepth-trap, because they kill the soul." ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি আজীবন সমাজ সংস্কার, অস্পৃশ্যতা বিলোপ, নারী স্বাধীনতা, সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে রাজনীতি করেছেন। তাঁর কাছে রাজনীতি মানব সেবার ব্রত নিছক ক্ষমতা লাভ করে জনগনকে শাসন করা নয়।বি. আর নন্দ লিখেন, "One who aspires to a truly religious life cannot fail to under take public service as his mission, and we are today so mach caught up in the political machine that service of the people is impossible with out taking part in politics..... if would have a profoundly trans formative effect on the rest of society..... political action was therefore the only available path to moksha."[৩৪]

মহাত্মা গান্ধী মানুষের স্বাধীনতার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তি ও ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লিখেন- "If the individul cease to count, what is left of society? Individual freedom alone can make a man voluntarily surrender himself completely to the service of society.... No society can possible be built on a denial of individual freedom."[৩৫] তবে বল্গাহীন বা অনিয়িন্ত্রিত স্বাধীনতাকে তিনি পশুর সঙ্গে তুলনা করেন। সমাজের স্বার্থে যারা স্বেচ্ছায় সামাজিক বিধি নিষেধ মান্য করে তারা ব্যক্তি ও সমাজের উভয়কে সমৃদ্ধ করে তোলে।

গান্ধীজীর মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বলতে বুঝায় জাতীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। জাতীয় জীবরে উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে যখন ব্যক্তি নিজেকে এমন ভবে শাসন করবে যে তার দ্বারা প্রতিবেশীর কোন অনিষ্ট হবে না তখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে আর্দশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে। সরকার সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত হলো সেই সরকারই শ্রেষ্ঠ যে নূন্যতম শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে। ব্যক্তির আত্মা থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের আত্মা থাকে না, এ জন্য তিনি রাষ্ট্রকে হিংস্রতার সংগঠিত প্রতীক রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাষ্ট্রের হিংস্রতা বন্ধের উৎকৃষ্ট ঔষধ হিসেবে গণতন্ত্রের কথা বলেন, "Democracy disciplined and enlightened, is the first thing in the world".[৩৬]

তিনি মনে করেন, "চরম স্বৈরতান্ত্রিক সরকারও জনগনের সমর্থন ব্যতিরেকে অধিককাল টিকে থাকতে পারে না। স্বৈরাচারী শাসক ক্ষমতার জোরে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ব করে, কিন্তু শাসিত শ্রেণীর অন্তর থেকে যখনি অর্ন্তহিত হয় তখন শাসকের ক্ষমতাও নিঃশেষিত হয়ে যায়।"[৩৭] জন

---

[৩৩] Etd.B.R Nanda,Mahatma Gandhi-125Years,p-379

[৩৪] Etd.B.R Nanda,Mahatma Gandhi-125Years,
Gandhi's Secularism Reconsidered-Antony Copley,p-375

[৩৫] তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ- ৪৫২

[৩৬] সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-৯৫

[৩৭] Edt. Mahatma Gandhi, Weekly Young India, June 30, 1920

Dhaka University Institutional Repository

সম্মতিতে গড়ে উঠা গণতান্ত্রিক শাসনে দুর্বলতম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ব্যক্তি উভয়ে সমান সুযোগ ও সমঅধিকার ভোগ করে। গণতন্ত্র কখনই হিংসার ভিত্তিমূলে গড়ে উঠবে না বা কিছু রীতি চালু বা বর্জন করলেই গণতন্ত্রের বিকাশ হবে না। একে প্রতিষ্ঠা করা যাবে মানসিকতা ও অন্তরের পরিবর্তন ও অহিংসার মাধ্যমে। হিংসার লেশমাত্র বিদ্যমান থাকলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবেনা। মহাত্মা গান্ধীর মতে গণতন্ত্রের পূর্ব শর্ত হচ্ছে অন্তর থেকে হিংসা উচ্ছেদ, অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও গ্রামীণ কুটির শিল্পের প্রসার।

গান্ধীজী ইউরোপীয় গণতন্ত্রের উপর আস্থা রাখতে পারেননি কারণ এটি ধনতন্ত্রের অবাদ সম্প্রসারণের সহায়ক যা ফ্যাসিবাদ বা নাজিবাদের বৈশিষ্ট মণ্ডিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে তোলে। সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল তবে, তাঁর লক্ষ্য ছিল শ্রেণীহীন , রাষ্ট্রহীন গ্রাম 'স্বরাজ' বা 'সর্বোদয়' সমাজ গঠনের দিকে যা মানব কল্যাণের কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকবে। গণতান্ত্রিক পন্থা কার্যকর করার জন্য তিনি 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রাম সমাজের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং চিত্ত খর্বতার সঙ্গে গান্ধীজী ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন; তবু পল্লীতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতীয় সমাজ আর্দশের মূল সূত্রটি। "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্মন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্ঠা, এর ভাল মন্দ দুই দিক থাকলেও এটা আমাদের দেশীয় এবং তার চেয়েও বড় এটা প্রাচ্য। পল্লী সমাজ মানেই আত্মীয় সমাজ বা প্রতিবেশী সমাজ।" এক ধ্বংস হতে দিলে মানব সম্মন্ধের মাধুর্য আর ধরে রাখা যাবে না।" "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ ঘটে গ্রামের মধ্যেই।" রবীন্দ্রনাথের এ কথার সাথে গান্ধী ছিলেন একমত।

মহাত্মা দেখেছিলেন রাষ্ট্রযন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মধ্যে বাধা পরে গেছে গ্রাম। তিনি চেয়েছিলেন বাইরের সাথে অর্থনৈতিক নানা সম্পর্ক থাকলেও তার সাহায্য ছাড়াও যাতে গ্রামগুলো স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠে। গ্রাম সমাজই ছিল গান্ধীজীর উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক সমাজ স্বপ্নের বাস্তব চিত্র। গ্রাম পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে গ্রামীন সমাজ তথা 'সর্বোদয় সমাজ' গঠন করে অহিংস রাজনীতির মাধ্যমে মানব সেবাই ছিল গান্ধীজীর ব্রত। গান্ধীজী উল্লেখ করেন,'Panchayat Raj: The greater the power of the Panchayets, the better for the people.'

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। 'আমার জীবন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের স্থান নেই। একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন।' গান্ধীজী সমাজতন্ত্রের সহিংস বিপ্লবকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখান করেছেন। *বলশেভিক বিপ্লবকে* তিনি সহিংস বিপ্লব ও আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার ফসল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই বস্তুবাদী সভ্যতার সূত্রে এমন এক চিন্তা ধারার জন্ম হয়েছে যা জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য হিসেবে বস্তুগত উন্নতির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। বলশেভিকবাদের প্রধান লক্ষ্য বস্তুগত উন্নতি "আমি চাই আমার ব্যক্তি স্বত্তার পূর্ণ বিকাশের স্বাধীনতা। বলশেভিক রাষ্ট্র শোষণ ক্রিয়াকে বহুলাংশে নির্মূল করেছে সত্য, কিন্তু সে সংগে ব্যক্তি স্বত্তাকে ধ্বংস করে মানবজাতির

Dhaka University Institutional Repository

মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে।"[৩৮] তবে তিনি বলশেভিকবাদ ও সমাজতন্ত্রকে এক করে দেখেননি। তার মতে বলশেভিকবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্র কাম্য যেহেতু এখানে মানব সাম্যের মূল্য স্বীকার করা হয়।

উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ঃ

উদ্দেশ্য সাধনের উপায়কে গান্ধী যে কোন মতবাদের আসল বলে গণ্য করেছেন । তিনি মনে করেন উপায় হীন হলে উদ্দেশ্য তার নিজস্বতা হারাবে। মহৎ উদ্দেশ্য উপায়ের জন্য ব্যর্থ হয়। Ends and means- অর্থাৎ লক্ষ্য ও পথের মধ্যে নীতিগত সামঞ্জস্য রক্ষাকারী স্মরনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ব ইতিহাসের মহত্তম মানবতা বাদী পুরুষ। গান্ধীজীর কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "There the just the same inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the tree. Ultimate progress towards the goal would be exact proportion to the purity of our means."[৩৯]

তিনি কোন বিষয় নিজে অনুশীলন না করে অন্যকে সে বিষয়ে কিছু করতে পরামর্শ দিতেন না। He never did on said any thing which he had not practised and he never expexted another man to do any thing which that man did not belive in.

গান্ধীজীর অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে উপমহাদেশীয় কৃষ্টি তথা ভারতীয় কৃষ্টিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। ধর্মকে তিনি রাজনীতি থেকে আলাদা করেননি। সকল ধর্মে শ্রদ্ধা ও মানব ধর্মের দীক্ষাই তাঁর ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ধর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। অহিংসার পথই শ্রেষ্ঠ এবং এ বিশ্বাসে বশবর্তী হয়েই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা নীতি হচেছ 'অহিংসা' ও 'সত্য'। একমাত্র অহিংসার অস্ত্র দিয়েই হিংসা দমন করা যায়। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক সমাজে উত্তোরণের শ্রেষ্ঠ পথও অহিংসার পথ। অহিংসা সর্ম্পকে গান্ধীজী বলেন- "For the love we have to practice towards our relatives or colleagues in our family or institution we have to practice towards our foes dacoits, etc. If we fail in one case, success in the other is a chimera..."[৪০]

তাঁর বিশ্বাস সহিংস সন্ত্রাস মূলক পন্থায় শান্তির রাজ্য তথা জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়না। "Vilent means will give vilent Swaraj. যে স্বাধীনতা হিংসার পথে আসে তা

---

[৩৮] Edt. Louis Fischer, The Essential Gandhi, p-304

[৩৯] Shriman Narayan, Gandhi:The Man and his Thought, p- I(a) 55

[৪০] D.G Tendulkar, Mahatma, Life of Mohan Das Karam Chand Gandhi, p- 303, Vol-5

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের জন্যেও বিপজ্জনক।[৪১] গান্ধীজীর এই অহিংস রাজনৈতিক চেতনা তাবৎ বিশ্বের রাজনৈতিক মতাবাদে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। অহিংসার নীতি দিয়ে তিনি শুধু উপমহাদেশকে জয় করেননি বরং একই সাথে সারা বিশ্বের মানুষের মনোজগতে মানবতার এক নতুন চিত্রপট তৈরী করেছেন। অহিংস নীতি অনুসারে লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে পন্থার কথা তিনি বলেন তা হচ্ছে 'সত্যাগ্রহ'।

সত্যাগ্রহঃ

"গান্ধীজীর কাজ হচ্ছে হিংসার সঙ্গে হিংসার দ্বন্ধ নয় হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্ধ বাধানো। এই হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্ধই হচ্ছে সত্যাগ্রহ। সক্রিয় যুদ্ধ যেখানে হাজার বছরের সত্যাগ্রহ সেখানে পচিঁশ বছেরের। দ্বান্ধিক আদর্শ বাদের সাথে অহিংস পদ্ধতি যোগ দিলে তার নাম হয় সত্যাগ্রহ। প্রেমের ক্রিয়াশীল নীতি থেকে সত্যাগ্রহ উৎপত্তি। এ নীতি ঘোষণা করে- যারা তোমাকে ঘৃণা করেছে তাদের ভালবাস। সুহৃদকে ভালবাসা সহজ কিন্তু শত্রুকেও ভালবাসতে হবে। অহিংসার মাধ্যমে ভালবাসার মাধ্যমে অন্যায়কারীব হৃদয় পরিবর্তনই সত্যাগ্রহের কাজ।

"সত্যাগ্রহ শুধু মাত্র একটি সংগ্রাম নয় একটি সাধনা। গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে বলেছেন 'সমূহ সংগ্রাম' (Total War)। নিজেকে গড়ে তোলার জন্য প্রতিদিনের জীবনে সত্যাগ্রহের প্রয়োজন। এর জন্য করণীয় হচ্ছে- ক) চিন্তায় আচরণে পবিত্রতা খ) ভয় বর্জন গ) ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস ঘ) বিনয় ঙ)সত্যনিষ্ঠ ও ভ্রান্তি স্বীকার চ) ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির সংযম ছ) নির্লোর্ভ ও জ) সংসার ত্যাগী নয় বরং আনন্দময় সংসারী হওয়া।[৪২]

অন্যায়কারীর আক্রমণ হতে আত্মক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা, নতুন সংগঠন বা কল্যাণ গড়ে তোলা এ তিন ক্ষেত্রেই সত্যাগ্রহ পদ্ধতি সমান সার্থক। সত্যাগ্রহে পরাজয়ের সম্ভাবনা নেই। রাজনীতি, সামাজিক, পারিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব। সত্যাগ্রহ লক্ষ ব্যক্তির হতে পারে যাকে বলে 'গণসত্যাগ্রহ' এবং এক ব্যক্তির ও সত্যাগ্রহ হতে পারে যা হচ্ছে 'একক সত্যাগ্রহ' বা ব্যক্তি 'সত্যাগ্রহ'। সত্যাগ্রহের ব্রতীকে বলা হয় "সত্যাগ্রহী"।

সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্যঃ

ক) সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হলে এর শক্তি ক্রমশ বাড়ে অস্ত্রে গোলা বারুদের মত কমে না।

খ) সত্যাগ্রহ সংগ্রামে অর্জিত সাফল্যের অধিকারের মালিক জনগণ এবং তা দেনা পাওনার মধ্যে থাকে না আপনা আপনি জন সাধারণের মধ্যে আসে।

---

[৪১] সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-৯৫

[৪২] সুবোধ ঘোষ, অমৃত পথযাত্রী, পৃ- ।।

গ) এ সংগ্রাম বহুলার উপর নির্ভরশীল নয়; অর্থাৎ বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহন এক মাত্র নয়। একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহীই বিরাট অন্যায়কে পরাভূত করতে পারে।

ঘ) সৎ ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিই সত্যাগ্রহ করতে পারে অন্য কেউ নয়।

ঙ) সত্যাগ্রহের সংগ্রামে নেতার উপস্থিতি জরুরী বিষয় নয়।

সত্যাগ্রহের স্বরূপঃ

একমাত্র সত্যাগ্রই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম যুদ্ধ। অসহযোগ (Non Co-operation), সবিনয় অবজ্ঞা (Civil Disobedience), সবিনয় প্রতিরোধ (Civil Resistance) প্রভৃতি আন্দোলন সত্যাগ্রহের রূপ। সত্যাগ্রহ শুধু মাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) নয়। সত্যাগ্রহের অহিংসা হচেছ-"অত্যাচারীর আঘাত খেয়েও তার প্রতিরোধ করতে হবে নিষ্ক্রিয়ভাবে। এ নিষ্ক্রিয়তা এমন হবে যার ফলে আঘাতকারীর মনে আহত ব্যক্তির জন্য শ্রদ্ধা জন্মে এবং আক্রমণকারী শেষ পর্যন্ত হিংসার পথ ত্যাগ করে মজলুম ব্যক্তির সঙ্গে নিরস্ত্র হয়ে আপোষ করতে বাধ্য হয়।"[৪৩]

গান্ধীজীর অহিংসা হচেছ বীরের অহিংসা। মনের দুর্বলতা বা অসায় বোধ থেকে হিংসার জবাবে অহিংস থাকা অমানুষের লক্ষণ। গান্ধীজী বলেন- সমস্যা সমাধানের পথ যদি 'কাপুরুষতা' ও 'হিংসা' হয় তবে এ দুইয়ের মধ্যে 'কাপুরুষতা' কে তিনি ঘৃণ্য ভাবে বর্জন করেছেন। অন্যায় প্রতিরোধের জন্য বীরের ন্যায় হিংসার খড়গের সম্মুখে অহিংসার বারতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে বীরের মত, ভীরু কাপুরুষের মত নয়। আঘাতে রক্তাক্ত হওয়ার ভয় থাকলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা সম্ভব নয়।

সত্যাগ্রহ সংগ্রামে পালনীয় কর্তব্যঃ

ক) সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সত্যাগ্রহীকে রাগদ্বেষমুক্ত রাজনৈতিক প্রতিবাদী হতে হবে। তিনি প্রতিপক্ষের রোষ সহ্য করে যাবেন, কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্তী হবেন না। সত্যাগ্রহী কখনও ইংরেজ জাতির পতাকাকে সম্মান দেখাবে না, তবে পতাকাকে লাঞ্ছিতও করবে না। খ) প্রতিপক্ষের সাথে বোঝাপড়ায় ব্যর্থ হলেই সত্যাগ্রহ প্রয়োজন। গ) সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গোপনীয়তার স্থান নেই। ঘ) সত্যাগ্রহের দাবী হবে নূন্যতম ও সংগত।

সত্যাগ্রহ সর্ম্পকে গান্ধীজী বলেন-"আমি চাই ভারতবাসীদের অন্তরে এই প্রত্যয় জাগ্রত হোক যে ভারতের একটি আত্মা আছে যা ধ্বংস করা যাবে না। এই আত্মা যে কোন দৈহিক দূর্বলতা জয় করতে এবং গোটা বিশ্বের সম্মিলিত দৈহিক প্রতিরোধ করতে সক্ষম।"[৪৪] তিনি আরো উল্লেখ করেন-

---

[৪৩] তোফায়েল অহমেদ, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-৩০৭

[৪৪] Dr. K. C. Choudhury, The role of Riligion in Indian Politics (1900-1925), p-254

"Non-Violence implies voluntary submission to the penalty for non-coperation with evil."[৪৫]

সমাজ ভাবনাঃ

মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্ন ছিল 'সর্বোদয় সমাজ' গঠন যেখানে প্রত্যেক মানুষ পরস্পরকে সমান মনে করবে এবং একে অপরের মধ্যে ভালবাসার রেশমী জালে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে। পল্লী ভিত্তিক সমাজই ভারত বাসীর জন্য আদর্শ সমাজ বলে তিনি মনে করতেন। যে সমাজে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা থাকবে এবং জাতীয় জীবনে কল্যাণমূখী ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে সেকুলার গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা থাকবে, সেটাই গান্ধীজীর ধ্যানের সমাজ। মহাত্মা বলেন, "The world is my family. All men as brother. I want the cultures of all the lands to be blown about my house as freely as possible; but I refuse to be blown off my feet by any..... I learn from other countries and imbibe their good qualities but he was against loosing one's own personality in the process."[৪৬] এই ছিল তাঁর বিশ্ব সমাজ ও কৃষ্টির মিলন ভাবনা।

সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি সকলের মনোযোগী হওয়ার জন্য তিনি বলেছেন- 'অস্পৃশ্যতা' (Untouchability) হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে যেভাবে গ্রাস করেছে তার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। অবহেলিত, অস্পৃশ্য, নির্যাতিত তথাকথিত ছোট জাতের মানুষদের তিনি দেবতা জ্ঞানে মূল্যায়ণ করেছেন। তিনি তাঁদের "হরিজন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীতে "হরিজন" পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে গান্ধীজী সমাজের এ ব্যধির অবসানের জন্য আজীবন সচেষ্ঠ থেকেছেন।

সমাজের বর্ণভেদ প্রথার ব্যাখ্যায় গান্ধীজীর মত হচেছ-প্রত্যেক মানুষ কোন না কোন সীমাবদ্ধতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন যা সে কখনও কাটিয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তি তার প্রবণতা ও শক্তি অনুযায়ী যে কাজের জন্য উপযুক্ত সে কাজে লিপ্ত থাকবে এটাই বর্ণভেদ প্রথার উদ্দেশ্য। এ অপূর্ণতার প্রেক্ষিতে কর্ম বিভাগের নিরীক্ষে বর্ণভেদ প্রথা মান্য করা যেতে পারে তবে সেটা কোন মতেই জন্মগত নয় কেবল মাত্র কর্মের প্রেক্ষিতই প্রধান। এ প্রথা দ্বারা উচুঁ ও নীচু প্রভেদ নির্ণয় মূর্খতা। বরং এ প্রথার ভেতর দিয়ে প্রত্যেকের স্বকীয়তা স্বীকার করে একে অন্যের উপর হস্তক্ষেপ না করে, প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রমের ফসল ভোগে নিশ্চয়তা নিশ্চিত করাই সকলের কর্তব্য। তিনি বলেন- "আমার বিশ্বাস, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কেবল তখনই বিকাশ লাভ করেবে যখন এই প্রথার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারব এবং তাকে কার্যকর করতে পারব।"[৪৭]

---

[৪৫] Dr. K. C. Choudhury, Documents on Political Thought in Modern India, Vol. II, p-380
[৪৬] Shriman Narayan, Gandhi:The Man and his Thought, p- I(a)55
[৪৭] Dr. K. C. Choudhury, Documents on Political Thought in Modern India, Vol. II, p-380-81

Dhaka University Institutional Repository

যে সমাজে কেই উঁচু কেউ নীচু নয় সকলে সমান এমন সমাজই গান্ধীজীর কাম্য। তিনি উল্লেখ করেন-"মাথাটা দেহের উপরি ভাগে থাকে বলেই সে উঁচু এবং পায়ের পাতা সর্বনিম্নে থাকে বলেই সে নীচু একথা সংগত নয়; বরং সত্য এই যে, উভয়ে দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে উভয়ে সমান। তেমনি সকল মানুষ যেহেতু একই সমাজের অংশ সে কারণে সকল মানুষ সমান।"[৪৮]

সুব্রত মুখার্জ্জী ও সুশীলা রাম স্বামীর কথায়, " To bridge the gulf between white collar and manual labour Ghandhi makes contribution by manual labour a pre-requisition for every single person. Elaborating his theory of consent Ghandhi proclaims that" real sawraj will come not by the acquisition of authority by a few but by acquisition of the capacity by all to resist authority when it is abused.." For achieving this people are to be educated so that they can regulate and control authority."[৪৯]

সমাজের নারী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পর সমান। মহাত্মা গান্ধীর মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান নেই। যারা সত্যাশ্রয়ী তারা নারী পুরুষের মধ্যকার মৌলিক অভিন্নতাও সমাজে নারীর সম অধিকার স্বীকার করে। নারী ও পুরুষের মধ্যে এক জায়গায় পার্থক্য বিদ্যমান তা হচ্ছে নারীর মাতৃত্ব গুণ যা পুরুষের মধ্যে নেই। " নারী প্রধানত গৃহকর্ত্রী এবং পুরুষ রুটির যোগানদার। পুরুষ খাদ্য যোগায় নারী তা সংরক্ষণ ও বন্টনের দায়িত্ব পালন করে। তা ছাড়া নারী যে প্রক্রিয়ায় শিশুদের লালন পালন করে পুরুষ সে রকম পারেনা। এ প্রক্রিয়াটি নারীর আয়ত্বে বলেই মানব জাতির বংশ বিস্তার ঘটেছে, নইলে মানব জাতি কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।"[৫০] তবে গান্ধীজী নারীকে পুরুষের কর্মে নিয়োজিত করাকে সমর্থন করেননি। সুবোধ ঘোষ তাঁ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যদি নারীকে পুরুষের কাজে নিয়োজিত করা হয় তবে উভয়ের জন্য মর্যাদাহানীকর। তার মতে এটা মানুষের জন্য সুখকর নয়।[৫১] গান্ধীজী নিজেই বলেছেন,"Woman Who Knows and fullfils her duty realises her dinified status. She is the queen, not the slave of the household, over which she presides."[৫২]

সর্বোপরি গান্ধীজীর মতে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে শ্রেণীহীন সর্বোদয় সমাজই আদর্শ সমাজ; এবং আদর্শ জীবন যাত্রা হচ্ছে-" Simple living and high thinking."

---

[৪৮] সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-৯৯

[৪৯] Subrata Mukherjee and Sushila Ramswamy, Facts of Mahtma Gandhi: Political Idea(2), p-XII

[৫০] ড. সৈয়দ মুকসেদ আলী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, পৃ-১৩১

[৫১] সুবোধ ঘোষ, অমৃত পথযাত্রী, পৃ- IV

[৫২] Edt. Mahatma Gandhi, Weekly Harijan, December12, 1934.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ ও মহাত্মা গান্ধী

উপমহাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে মহাত্মা গান্ধীর নাম সর্বাগ্রে। এ বিষয়ে তাঁর অবদান অনন্য। সর্ব ধর্মে বিশ্বাসী অহিংস, সত্যাগ্রহী মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের গোড়াপত্তন সেই দক্ষিণ আফ্রিকায়। ধর্ম রাষ্ট্র ভাষা জাতীয়তা গোত্র ইত্যাদির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার সংগ্রাম করেছেন। আফ্রিকায় বর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু পিছুপা হননি। শোষিত বঞ্চিত, নির্যাতিত, কালো মানুষের পাশে থেকে অহিংস সত্যাগ্রহের আন্দোলন শুরু করেছেন। ভিন্ন রাষ্ট্র, ধর্ম, কৃষ্টি ও মানুষের জন্য কোন বিজাতীয় এক ব্যক্তির অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার পক্ষে এমন নিঃস্বার্থ সক্রিয় সংগ্রামের উপমা পৃথিবীতে একমাত্র গান্ধীজীই।

সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সংগ্রামের শুরু; পরবর্তীতে তিনি নিজ ভূমিতে এসে শোষণ, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতার হাত থেকে স্বদেশবাসীকে ও স্বদেশকে মুক্তির উদ্দেশ্যে অহিংসার মাধ্যমে স্বাধীনত ও অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি বলেন, Our independence would be complete only if is as much for the price as for the peasant , as much for the rich land owners as for the landless tiller of the soil, as much for the Hindus as for the Muslims, as much for the Parsis and Chirstians, as for the Jains , Jews and Sikhs, irrespective of any distinction of caste or creed or status in life.[১]

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা অসাম্প্রদায়িক ও উদার চেতনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী গান্ধী প্রায় ২১ বছর পর বহুধর্ম, ভাষা, গোত্র, কৃষ্টির বৈচিত্র্যে মন্ডিত নিজ মাতৃভূমি উপমহাদেশ তথা ভারতবর্ষে (বর্তমানে বাংলা-পাক-ভারত) এসে স্বদেশের জন্য কাজ শুরু করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 'এপেলো' জাহাজে তিনি বোম্বে (মোম্বাই) পৌঁছানোর পরে রাজার জন্ম দিনের সম্মানে তাঁকে গোল্ড মেডেল দিয়ে "কাইজার-ই-হিন্দ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ভারতীয় জননেতা রূপে তখন ব্যপক ভাবে বরণীয় হন। এ প্রসঙ্গে প্রদীপ কুমার পারিদা লেখেন- "His entry into Indian politics was a powerful

Dhaka University Institutional Repository

current of fresh air that made us stretch our selves and take deep breadths, a beam of high that pierced the darkness and removed the scales from our eyes, a whirlwind that upset many things but most of all the making of peoples mind."[২]

একই বছর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'শান্তি নিকেতনে' এলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে '*মহাত্মা*' বলে আখ্যায়িত করেন। হিরণ মুখার্জ্জীর কথায়, "He was called 'Mahatma' at Kathiawad reception in January, 1915 and in a letter dated February 1915 Rabindranath Tagore called him by that name."[৩]

বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সম্প্রীতিতে পাশাপাশি বসবাস ভারত উপমহাদেশের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য। মাঝে মধ্যে ধর্মীয় কারণে কিছু সহিংস বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও তাদের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছিলনা। যুদ্ধ বিগ্রহ মসনদ দখল এর কৌশল মূলতঃ রাজন্যদের মধ্যেই বিস্তারিত ছিল। যুগ যুগ ধরে সহ অবস্থানের কৃষ্টিই ছিল উপমহাদেশে চিরায়ত। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের পর থেকেই সাম্প্রদায়িক ভেদভাব ভারত উপমহাদেশের রাজনীতিকে কুলষিত করতে শুরু করে; যে কারণে 'মুসলিম লীগ' ও 'হিন্দু মহাসভা' নামের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'মর্লি মিন্টো' এর শাসন সংস্কার ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার গোড়াপত্তন করে। এর পরিণামেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ প্রসঙ্গে যে কথাটি উপস্থাপন যুক্তি সংগত তা হচেছ-"সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সমূহ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণ নয় বরং তার পরিণাম।[৪] পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, সংরক্ষিত আসন ও এ জাতীয় ব্যবস্থা হলো সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নমুনা।

উপমহাদেশের রাজনীতিতে যখন স্বাধীনতার দাবি ও সাম্প্রদায়িকতার বিভীষিকা প্রকটতর হচেছ ঠিক সে ক্ষণেই মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। গান্ধীজীর ধ্যানের ভারত ছিল-"In which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice; an India in which there shall be no high class and low class of people; an India in which all communities shall live in perfect harmony, Such a polity free of violence and exploitation would be based equality, self sufficiency and harmonious relationship between capital and labour. In such a society there can be no room.. for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women

---

[২] Edt. Mahatma Gandhi, Weekly Young India, March 5, 1931.

[৩] Pradeep Kumar Parida,Understanding the cause of communalism in post independent India. Man and Depelopment, June-2002, Vol XXXIV No.2

[৪] Hiren Mukerjee, Gandhiji: A Study, p-15

[৫] The Indian Annual Register 1939, 22nd Part, p-369.

Dhaka University Institutional Repository

will enjoy the same rights as men, Since we shall be at peace with all the rest of the world, neither exploiting, nor being expoited, we should have the smallest army imaginable. All interests not in conflict with the interests of the dumb millions will be scrupulously respected, whether foreign or indigenous..... This is the India of my dreams ..... I shall be satisfied with nothing else."[৫] তিনি এ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নিরন্তর কাজ করে গেছেন।

ইংরেজ সরকারের কূটকৌশলই ক্রত ভারত উপনহাদেশের দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' কে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে। এ সাম্প্রদায়িকতা ভারতবাসীদের ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামকে যে সমস্যা সঙ্কুল করে তুলেছিল তা গান্ধীজী আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এ জন্যে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের শুরুতেই 'হিন্দু' ও 'মুসলমান' এ দুই প্রধান সম্প্রদায়কে একসাথে নিয়ে কাজ করতে সচেষ্ঠ হন। গান্ধীজীর অহিংস নীতি, ধর্ম সম্পৃক্ত ভারতীয় সেকুলারিজম, ধর্ম বিশ্বাস, সকল ধর্মে শ্রদ্ধার মানসিকতা তাঁকে সর্বদা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চেতনা বিকাশের কাজেই ব্যস্ত রেখেছে। গান্ধীজী অনুভব করেছিলেন ধর্মীয় ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছাড়া ভারতীয়দের স্বাধীনতা ও কল্যাণ সম্ভব নয়। এ চিন্তাটি মাথায় রেখেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ও তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষ গড়তে কাজ করে গেছেন।

গান্ধীজী ১৯১৫-১৬ খ্রীস্টাব্দে রেলে তৃতীয় শ্রেণীতে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমন করেন। উদ্দেশ্য জনগণকে স্বদেশ প্রেম ও সম্প্রীতির মন্ত্রে উজ্জিবীত করা। তাঁর সভা গুলোতে সব ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠকরা হতো আর গাওয়া হতো-

ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম
সাবকো সুমতি দে ভগবান
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।

এবং তাঁর প্রচেষ্ঠা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করা ও স্বদেশ প্রেমে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। এ বিষয়ে 'গান্ধী প্রসঙ্গে' পত্রিকায় বলা হয় "Gandhiji now equal respect for all religions and really decentralized socio-economic system is true guarantee for communal and religions harmony."[৬]

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের 'বঙ্গভঙ্গ' ও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'ভারতীয় কাউন্সিল আইন' বা 'মর্লিমিন্টো সংস্কার' হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ দ্বন্দ্বের হিংসাকে দূরন্ত বেগে বেগবান করে। এর সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও হয়ে উঠে প্রকটতর। গান্ধীর সমর্থনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্প্রীতি দৃঢ়

---

[৫] M. K Gandhi , India of my dreams (Compiled by Prabhn), p- 9-10
[৬] Prof. J.S Mathur. Gandhi: A Sublime Failure, Gandhi Parasang, Vol-V, No. 1,October, 2002

Dhaka University Institutional Repository

করণ, স্বাধীনতা অর্জন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার রোধকল্পে মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস এর মধ্যে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর লখ্নৌতে এক বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার পক্ষে একমত প্রকাশ করে এ সম্মেলনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা 'লখ্নৌ প্যাক্ট' নামে পরিচিত। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ও হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ক্ষেত্রে উপমহাদেশের ইতিহাসে এটি একটি অন্যতম ঘটনা।

ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্বতন মূলক 'রাউলাট আইন' বাতিলের জন্য ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল মাহাত্মা গান্ধী সারা উপমহাদেশ ব্যাপী 'হরতাল' আহবান করেন এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে গান্ধীজী একাত্ম করতে সফল কাম হন। এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, শিখ, পার্সী নির্বিশেষে সকলে অংশ গ্রহন করে; যার ফলে এক অভূতপূর্ব জন ঐক্যের সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ঢেউয়ের মধ্যে গান্ধীজীর এ আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির গোড়াপত্তনের এক মাইল ফলক।

পরবর্তীতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর বৃটিশ সরকার যখন তুরস্ককে খন্ড বিখন্ড করতে উদ্যোগী হন; তখন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনার প্রেক্ষিতে তুর্কী খেলাফতের অখন্ডতা রক্ষার জন্য এক বৃটিশ বিরোধী প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলে; যেটি "খিলাফত আন্দোলন" নামে পরিচিত। মহাত্মা গান্ধী এ সময় মুসলিম নেতৃবৃন্দের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাদের সমর্থন করেন। কংগ্রেসের পতাকা খিলাফত আন্দোলনের সময় তৈরী হয়। এ পতাকায় গেরুয়া রং হিন্দু, সবুজ রং মুসলিম এবং সাদা রংকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ সময় বন্দেমাতেরম্ সঙ্গীতটি বিভিন্ন সভায় গীত হতো কিন্তু মুসলীম লীগের আপত্তির কারণে পরে এ গানটির সম্পূর্ণ অংশটি বাদ দিয়ে প্রথম দুই অন্তরা গাওয়া হয়। গান্ধীজী কংগ্রেস সদস্যদের বলেন, " যদি একজন মুসলমান এতে আপত্তি করে তবে সভার শুরুতে সঙ্গীত গাওয়া এবং পতাকা উত্তোলণের দরকার নেই। গান্ধীজীর এ অসাম্প্রদায়িক চেতানার ফলে শুধু সমর্থন নয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 'খিলাফত কনফারেন্স' এর সভাপতি হিসাবে মহাত্মা গান্ধীকে মনোনীত করা হয় এবং খিলাফত অধিকার রক্ষার জন্য ভাইসরয়ের নিকট তিনি ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বার্থের লড়াইয়ে নিজেকে সক্রিয় সম্পৃক্ত করে আন্দোলন করার বিরল দৃষ্টান্ত এবং মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের শিক্ষা প্রসারের এমন বাস্তব উপমা একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই।

যুদ্ধের পর ভারতবাসীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, *জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড* এবং রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী সাড়া ভারতবর্ষ ব্যপী "অসহযোগ আন্দোলনের" সূচনা করেন। অসহযোগ আন্দোলনকে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে একদিকে যেমন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্রোতধারাকে বেগবান করেন; অন্য দিকে স্বরাজ দাবীর পক্ষে হিন্দু মুসলমানকে একত্রে করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রবলতর করে তোলেন। শৈলেশ কুমার তাঁর 'দাঙ্গার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে প্রীতি ও সম্ভাবনার প্রবল বন্যা জাগল। ভারতের ইতিহাসে এ অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টির পিছনে ছিল মহাত্মা গান্ধীর যাদু।..... হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এমন এক অভূতপূর্ব প্লাবন আসে যাতে অতীতের সব বিবাদ বিসংবাদ যেন নিমিষে মুছে যায়। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা এক বিস্মৃত অধ্যায়ে পরিণত হয়।"[৭]

গান্ধীজীর এই অসহযোগ আন্দোলন উপমহাদেশের ইতিহাসে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের এক স্বর্ণালী দিন। রাজনীতির ইতিহাসে এক কিংবদন্তী। এ সময় সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃত্ব বোধের এমন এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হলো যে, "হিন্দুরা প্রকাশ্যে মুসলমানদের হাত থেকে জল নিয়ে পান করতে আরম্ভ করল এবং মুসলমানরাও অনুরূপ আরম্ভ করলেন। শোভা যাত্রা সমূহে যে সব ধ্বনি উচ্চারিত হতো এবং যে সব উদ্‌ঘোষ (শ্লোগান) লেখা ব্যানার বহন করা হতো, তার মূল বক্তব্য ছিল হিন্দু মুসলমান ঐক্য। মসজিদের বেদী থেকে এমনকি হিন্দু নেতাদের বক্তৃতা দিতে দেয়া হয়েছিল।

'এ সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত হিন্দু সন্ন্যাসীকে শুধু দিল্লীর জামা মসজিদের বেদী থেকে ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য আহবান জানাতে আমন্ত্রন করা হয়নি, বহু জায়গায় মুসলমানরা স্বেচ্ছায় গো-কোরবানী পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। হিন্দুরাও সাড়া দিয়ে শোভা যাত্রায় মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানো বন্ধ করে দিয়েছিল। হিন্দু মুসলিম ভাই ভাইয়ের এ সুবর্ণকালে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্নই ছিল না।"[৮]

বৃটিশদের 'ভাগ কর এবং শাসন কর' এ নীতির উৎপাদ সাম্প্রদায়িকতা, অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার কাছে পরাস্থ হয়ে গিয়েছিল। এ সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু মুসলমান সব নেতাদের ঐক্য জাতীয়তাবাদী মঞ্চের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগের ফলে স্বরাজ অর্জনের দাবীতে উপমহাদেশের সকল জনগণের মনে এমন এক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যে সকলে বিদেশীপণ্য বর্জন, চাকুরী বর্জন এমনকি করখাজনা প্রদান বন্ধ করে দেয়। 'খিলাফত' ও 'অসহযোগ' এর এ মিলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন গান্ধীজী। তিনি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে এ আন্দোলনের সময় তাঁর খেতাব কাইজার-ই-হিন্দ, যুলু যুদ্ধপদক, বুর যুদ্ধপদক ভাইসরয়ের নিকট প্রত্যার্পণ করেন।

হিন্দু মুসলমানের মিলিত এ আন্দোলন এক মহা শক্তিশালী গণআন্দোলনে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন অহিংস থাকেনি। সহিংস রূপ নিয়ে ১৯২২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে উত্তর প্রদেশের চৌরাচৌরিতে একদল জনতা থানা আক্রমন করে ১ দারোগা সহ ২১ জন সিপাহীকে অগ্নি দগ্ধ করে মারলে মাহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন ইস্তফা ঘোষণা করেন। চৌরাচৌরি সহিংস ঘটনার জন্য অহিংস মহাত্মা দুঃখ প্রকাশ করে নিজে ৫ দিন 'উপবাস' করেন। গান্ধীজী প্রসঙ্গে ল্যারি কলিন্স ও ডোমিনিক ল্যাপীয়ার মন্তব্য করেন- "To a century fraught with violence,

---

[৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৩২
[৮] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

Gandhi had offered an alternative, his doctrine of ahimsa-non-violence. He had used it to mobilize the message of India to drive England from the subcontinant with a moral crusade instead of as armed rebellion, prayers instead of machine-gun fire, disdainful silence instead of the fracas of terrorists bombs."[৯]

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার উত্থান দেখে ইংরেজ রাজ ভীত হয়ে পরেন। তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কৌশল এ সময় পরাস্থ হয় ও ধর্মীয় অস্মিতার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক বিভক্তির নীতি মুষড়ে পড়ে। তারা বুঝতে পেরেছিলেন মহাত্মার অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগনকে একত্রে করে বৃটিশ রাজের ভীতকে উপড়ে ফেলে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পথকে নিশ্চিত করবে। মহাত্মা গান্ধীর এ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনাকে স্তব্ধ করার জন্য ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১০শে মার্চ সবরমতি আশ্রম থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। অতপর ১৮ই মার্চ ৬ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে গান্ধীজীকে জেলে পাঠিয়ে দেয়।

গান্ধীজী কারারুদ্ধ হওয়ার পর তুরস্কের খলিফাকে পদচ্যুত্য করে *গাজী কামাল আতাতুর্ক* তুরস্কের অধিকর্তা হয়ে ভারতীয় খিলাফতীদের নিন্দা করেন এবং প্যান ইসলামের মূলোৎপাটন করেন। এমতাবস্থায় উপমহাদেশের হতাশা পীড়িত খেলাফত আন্দোলনকারীদের একাংশ গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করেছে বলে অভিযোগ করে। আবার হিন্দুদের একাংশ মুসলমানদেরকে তাদের স্বার্থ সচেতন করার অভিযোগে গান্ধীজীকে অভিযুক্ত করেন। এ পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা ভেঙ্গে যেতে থাকে ফলে আবার শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে উপমহাদেশ ব্যাপী আবার শুরু হয় ব্যপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, এ সময় পাঞ্জাব, মুলতান, দিল্লী, ঝাঁসি, নাগপুর, বিশালপুর, গুলবারগা, শাহজানপুর, কোহাট, লখ্নৌ এবং বদাঁয়ুতে এক রক্তক্ষয়ী প্রবল দাঙ্গা ঘটে। কোহাটের দাঙ্গা সর্ম্পাকে মন্মথনাথ গুপ্ত উল্লেখ করেন, "The Kohat riots really broke the back bone of India."[১০]

এমনি ভাবে ভারত যখন আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কবলিত তখন গান্ধীজী মুক্তি পান ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী। উপমহাদেশ ব্যাপী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি হিন্দু মুসলমান একতার জন্য উপবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য মহাত্মা গান্ধী মৌলানা মুহাম্মদ আলীর বাস ভবনকে নির্বাচন করেন। মহাত্মা স্বয়ং সাম্প্রদায়িক রাখী বন্ধনের জন্য গেলেন মোহাম্মদের বাড়ী। '১৯২৪ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ২১ দিনের

[৯] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-১৯৮
[১০] Manmathnnath Gupta, Gandhi and his Time, p-252

Dhaka University Institutional Repository

একটানা উপবাস করলেন।[১১] এর ফলে গান্ধীজীর আহবানে সাড়া দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়। কিন্তু দাঙ্গা একেবারে বন্ধ থাকেনি। "১৯২৫ সনে কলকাতা ও দিল্লীতে ব্যাপক দাঙ্গা হয় এতে প্রায় ৮টি মন্দির, ৭টি মসজিদ, ৩টি গুরুদ্বার ও ৩টি দরগাহকে হয় ভাংচুর নচেৎ অপবিত্র করা হয়। পুলিশ সহ সাধারণ মানুষ মরে ২০১জন।[১২]

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের ফতেপুর, রাওয়ালপিন্ডি, ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা, এলাহাবাদ, ছাপরায় দাঙ্গা হয়। "অসহযোগ ও খিলাফতের সময় যে হিন্দু সন্ন্যাসীকে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের পুরধা বিবেচনা করে দিল্লীর জামা মসজিদের আমন্ত্রিত বক্তার মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, ১৯২৬ সনে মুসলমানের শত্রু মনে করে ঠান্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে এক ধর্মান্ধ মুসলমান যুবক আব্দুল রশীদ।[১৩] হিন্দু মুসলিম বিরোধের ব্যপকতার দিনগুলোতে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর মুসলিম সর্বদলীয় সম্মেলনে মৌলানা আহম্মদ আলীর মত নেতা ঘোষণা করেন- "মুসলমানদের হিন্দু সংখ্যা গরিষ্টতা সম্মন্ধে ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারন অতীতে তাদের তাবৎ ধর্মযুদ্ধে একজন মুসলমান ৩ জন কাফেরকে পরাজিত করেছে।"[১৪] এরূপ বক্তব্য থেকে সহজে প্রতীমান হয় যে সে সময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দাপট কত বেড়েছিল।

দাঙ্গার এ পৌনঃপুনিকতার মধ্যে গান্ধীজী বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জনগনকে উদ্বুদ্ধ করে মানবতা রক্ষার কজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন। প্রদীপ কুমার পারিদা এ প্রসঙ্গে লেখেন- " He was sure that the disease of violence could be cured only through non-violence, love and service of mankind irrespective of their caste, colour and creed. He wanted to instill the hope among the weak that our country had a great and we would live amicably as Indians. He was convinced that communal fanaticism could be climinated only through love and compassion and brotherhood of mankind Gandhiji's entry into Indian politics brought in the history of Indian's independence movement."[১৫] জনগনকে জাতীয় চেতনায় মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় সাড়া ভারতবর্ষ ব্যাপী। এ আন্দোলনটি "সল্ট মার্চ"নামে খ্যাত। সল্ট মার্চ আন্দোলনের ফলে গান্ধীর নেতৃত্বে আবার অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রাণ সঞ্চার হয়। মানুষের অশুভ শক্তিকে গান্ধীজী গঠন মূলক কজে প্রবাহিত করে স্বদেশী চেতনার

---

[১১] তোফাজ্জেল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ- ২৫৪

[১২] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪২

[১৩] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪২

[১৪] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৪২

[১৫] Pradeep Kumar Parida.Understanding the cause of communalism in post independent India, Man and Depelopment, June-2002, Vol XXXIV No.2

Dhaka University Institutional Repository

শিখাকে আবার হিন্দু মসলমানের মিলিত ত্যাজে দেদীপ্যমান করে তোলেন। কাধে কাধ মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যে আবার উপমহাদেশের জনগণ একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী এ বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এ সময় তারা গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন সংগঠন কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষিত করে। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের বলে জনগণ পিছুপা হননি। তুমুল বেগে আন্দোলন এগিয়ে চলে। পরে অরউইন সমঝোতায় পৌছার লক্ষ্যে গান্ধীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং এর ফলে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানালে তিনি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য বিলেত গমন করেন। বৈঠকটি ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে গান্ধীজী অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষ নিয়ে বিরোধীতা করলে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়না। ২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোম্বে বন্দরে পৌছলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মহাত্মার এই যে দৃঢ়তা এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি তাঁর যে আকুণ্ঠ সমর্থন; সেটা স্বদেশবাসীর সমালোচনা এবং বৃটিশদের কারাদন্ড ও নির্যাতন নসাৎ করতে পারেনি। অসাম্প্রদায়িক চেতনার ব্রতে গান্ধীজী নির্ভীক, অটল থেকেছেন নিরন্তর।

গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেননি। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষিত হয়। এ ঘোষণায় অনুন্নত শ্রেণীগুলোকে পৃথক করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। গান্ধীজী এ সময় জেলে ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও হরিজনদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রহিত করার জন্য তিনি জেলেই ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। গান্ধীজীর জীবন বাচাঁতে তখন হিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণীর নেতারা গান্ধীর সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন যা "পুনা চুক্তি" নামে খ্যাত। এতে বলা হয় যে, অনুন্নত শ্রেনীর জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে তবে তারা পৃথক নয় সকলের সাথে ভোট দান করবে; এবং সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা রহিত করা হবে। পরবর্তীতে কারাবাস কালেই তিনি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় 'হরিজন' পত্রিকা স্থাপন করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি অনুন্নত শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে বর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার চালান কিন্তু সরকার বাধা দেওয়ায় তিনি ১৬ই আগস্ট জেলেই উপবাস শুরু করেন। এ সম্পর্কে ধনঞ্জয় কীর লেখেন- "July 19 Gandhi return to Ahmedabad where he visited Mirabehn in Sabarmati Jail, He announced his intention to disband the Sabarmati Ashram and asked the Bombay Government to take possession of it later, on September 30, 1933. Gandhi offered in Sabarmati Ashram for Harijan work to the servants of untouchables society which was a new name given in July 1933 to the all Indians Anti un touchability league Much later, on September 5, 1933 the people of the Sabarmati Ashram was vested in the trust for the uplift of Harijans and

became officially known as Harijan Ashram."[১৬] এ থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে মহাত্মা গান্ধী অসাম্প্রদায়িক চেতনার কত বড় সেবক ছিলেন।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর নিজের ইচ্ছায় গান্ধীজী কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি হ'তে ইস্তফা দেন; তবে জনগণের রাজনীতির সাথে আজীবন জড়িত থাকেন। এ বছরই ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে। ১৪ই মার্চ হোলির দিনে যে দাঙ্গা শুরু হয় তা পৌনঃপুনিকভাবে চলতে থেকে ১৭ই, ১৮ই, ১৯ই মার্চ প্রবল হয়ে ঢাকাসহ নারায়ণগঞ্জের, গ্রামাঞ্চলকেও গ্রাস করে। এতে বহু লোক নিহত হয়। এই বছরই ১৮ই এপ্রিল থেকে ২২ পর্যন্ত দাঙ্গা হয় আহমেদাবাদে যেখানে প্রায় ৫৫ জন মৃত্যু বরণ করে। ২৫শে এপ্রিল বোম্বে প্রথম দাঙ্গা শুরু হয়ে মে এর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলে। আবার ২২শে মে থেকে ৩ রা জুন এ সময় গোরা সৈন্য নামিয়েও দাঙ্গা আয়ত্বে আনা সম্ভব হয়নি।

গান্ধী অসাম্প্রদায়িকতার চেতনায় সম্প্রীতি অর্জনের লক্ষ্যে আবার জনগণকে একত্রে করার কর্মে ব্রতী হন। সূচনা করেন "ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement)"। এ সময়ই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ডাক দিলেন, 'ভাগ কর এবং যাও। যদি ভাগ না কর থাক।'[১৭] এর মাধ্যমে জাতীয়তার মন্ত্রে আবার উপমহাদেশের জনগণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করে ফেলেন। গান্ধীজী বিচলিত হননি বরং তাঁর নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে ভারতবাসী আবার ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সম্পৃক্ত হয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট বোম্বেতে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। ৯ই আগস্ট এ উপলক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসপথে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং পুনাতে আগাখান প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বন্দী অবস্থাতেই গান্ধীজীর দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই আগা খান প্রাসাদে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ বছরই আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভাইসরয় ও ভারত সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক গোলযোগের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে পত্র যোগাযোগ হয়।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী আগাখান প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরী বাঈ এর দেহ ত্যাগ ঘটে। বৃটিশ রাজ "বিভক্ত কর এবং শাসন কর" নীতির ভিত্তিতে গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে উপমহাদেশে আবার সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সংবাদে পেয়ে অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে আগাখান প্রাসাদে বন্দী অবস্থাতেই গান্ধী টানা ২১ দিন উপবাস করেন। প্রিয়জন হারানোর ব্যথা ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার মর্ম বেদনায় এ সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে।

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে গান্ধীজী বিনা শর্তে মুক্তিপান। মুক্তির পর অসুস্থ গান্ধী কিছুদিন বিশ্রামের পরই বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক পদক্ষেপের সূচনা করেন। প্রথমে তিনি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলীমলীগের সাথে সমঝোতায় আসার নতুন প্রচেষ্ঠা শুরু করেন। যদিও জ্যেষ্ঠতার বিচারে তাঁর কাছে মিঃ জিন্নাহ্ সাহেবেরই আগে এগিয়ে আসার কথা কিন্তু গান্ধীজী

---

[১৬] Keer Dhananjay, Mahatma Gandhi:Political Saint and unarmed Prophet, p-585
[১৭] কংকর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

অসাম্প্রদায়িকতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজে এগিয়ে এলেন। মহাত্মা মুসলীম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে সাক্ষাৎকার চেয়ে যে চিঠি লিখলেন। সেখানে মিঃ জিন্নাহকে তিনিই প্রথম 'কায়েদ-ই-আযম' বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি মিঃ জিন্নাহ কে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে যুক্ত ভারতের পক্ষে মত দেওয়ার অনুরোধ জানান। গান্ধীজী বলেন- "As I imagine the Lahore Resolution in practice, I see nothing but ruin for the whole India."

কায়েদ-ই-আযম তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে অটল রইলেন। "মুসলমান জনগন যে স্বতন্ত্র এক জাতি" ইহাই তাঁহার কথা; আলোচনা ব্যর্থ হলো। মিঃ জিন্নাহ্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন- No power on earth can prevent Pakistan." ভারতীয় জনগনের নিকট তাঁর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বপক্ষেই যুক্তি দিলেন। তিনি অমোঘ বাণী ঘোষণা করলেন- 'পাকিস্তান স্বাধীন কর নইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।' এ প্রসঙ্গে এস, বি দিক্ষীত লেখেন- " It originates with a communal ideology, grows with communal politics and strengthens it self with communal violence. It is not the phrality of religions or religious communities that produces fundamentalism. It is the communal ideology with its communal consciousness. Capitalist economic development has always been unequal and uneven. It benefits only a few and hurts many."[১৮]

গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার পথ বাধাগ্রস্থ হলো। মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের আলাদা স্বত্বা অস্বীকার করেননি। তিনি তাদেরকে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি থেকে বিরত থেকে মুসলমানদেরকে অনুরোধ করেছেন সেকুলার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে। কল্যাণমূলক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পক্ষে মুসলীমলীগের নেতৃত্ব গান্ধীজীকে সহযোগিতা করেনি। বরং এ প্রসঙ্গে মিঃ জিন্নাহ্ ভাষণে বলেছেন, " We have repeatedly declared that the cardinal principle and aim of the Muslim League is to safe guard the political rights and status of the musalmans of India, The Muslims in India are nation."[19]

গান্ধীজীর সাথে মিঃ জিন্নাহর আলোনার বিষয়টিকে অনেকেই বাধা দিয়েছিলেন কেননা এটা ফলপ্রসূ হবে না, কিন্তু গান্ধী এটা মানেনি । তিনি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাস্তবায়নের জন্য যে কোন মূল্যে কাজ করতে রাজী হয়েছেন নিজের স্বকীয়তা ম্লান করে হলেও। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন-"আমার মনে হয় মিঃ জিন্নাহ্র প্রতি গান্ধীজীর এ মনোযোগ ছিল এক মারাত্মক

---

[১৮] S.B Dixit, Commonual Tenssion: Cause and Remedies, in Ramji Lal (ed.) Communalism Problem in India: A Symposium, Sahadra, Delhi, p-72

[১৯] Jamiluddin (edt.), Speech and writings of Mr. Jinnah, Vol-I, p-339.

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ভ্রান্তি। এতে মিঃ জিন্নাহ নতুন ও অতিরিক্ত গুরুত্ব পেলেন যার পুরো সদ্ব্যবহার তিনি পরে করেছেন।.... বিশের দশকে কংগ্রেস ত্যাগের পর জিন্নাহর রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক খানি কমে গিয়েছিল। প্রধানতঃ গান্ধীজীর পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেয়ার জন্যই জিন্নাহ ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্ব ফিরে পেয়েছিলেন।"[২০]

"গান্ধী ও জিন্নাহর আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হবার পর হিন্দুদের একটি অংশও গান্ধীজীর প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে উঠে..... মহা সভা এবং রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ নেতৃত্বাধীন একটি অংশ প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগল যে গান্ধীজী হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেছেন।[২১] কিন্তু গান্ধীজী তাঁর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে অটল রইলেন।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশ ও আসাম, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে অস্পৃশ্যতা বর্জন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও হিন্দুস্থানী জাতীয় ঐক্যের প্রচার চালান। কংগ্রেসের রাজনীতির নেতৃত্বে না থেকেও মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস নীতি এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে মানবতা ও মানুষে মানুষে সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে ৬০ বছর বয়সেও উপমহাদেশের ব্যাপক এলাকা ভ্রমণ করেন।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে একবারই মাত্র মাহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন। কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় দল হিসাবে তিনি কখনওই একে ধর্মীয় বলয়ে আবদ্ধ করেননি। যখন মুসলিমলীগ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার নিরীক্ষে শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত; তখন কংগ্রেসকে শুধু হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় মুসলিম লীগের বিপরীতে ধর্মীয় দলের ঘোষণা দেননি। বরং কংগ্রেসের অহিন্দু সদস্যদের অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের 'লর্ডওয়েভেল পরিকল্পনা' যা 'সিমলা কনফারেন্স' নামে পরিচিত সেখানে কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বের জন্য " কংগ্রেস যে তালিকা জমা দিয়েছিল তাতে মাত্র দু'জন হিন্দু নাম ছিল। এতে করে প্রমানিত হয়েছিল (যদি প্রমানের প্রয়োজন হয়) কংগ্রেসে কোন হিন্দু সংগঠন নয়। .... পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই মুসলমান, খ্রীস্টান ও পার্সীদের প্রতিনিধিত্ব করছে জেনেও তারা দ্বিধা করেনি।"[২২]

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা উত্থাপিত হয় জুলাই মাসে মুসলিম লীগ এ পরিকল্পনা থেকে তাদের সম্মতি প্রত্যাহার করে নেন এবং পাকিস্তান অর্জনের পক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। শহীদ ছদ্মনামে সোহরাওয়ার্দী ৫ আগস্ট কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছিলেন- ' কোন মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রক্তপাত ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কি? মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন কিছু এত প্রিয় কিংবা মহৎ নয়।' এ প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট সারা ভারত উপমহাদেশে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস " (Direction Action Day) পালনের ডাক দেয়া হয়।

---

[২০] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া ইউনস ফ্রিডম, পৃ-১০৯
[২১] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া ইউনস ফ্রিডম, পৃ-৭৭
[২২] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া ইউনস ফ্রিডম, পৃ-১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে পাকিস্তান' মনোভাবের পরিস্থিতে বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ১৬ তারিখ ছুটি ঘোষণা করলেন। "Ghazanfar Ali Khan, one of the five league nominees to the government, had not minched his words. "We are going into the Interim Government to get a foothold to fight for our cherished Goal of Pakistan. The interim Government is one of the fronts of the direction campaign."[২৩] মিঃ জিন্নাহ বিশেষ কোন কর্মসূচী না দিলেও মুসলীম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন কোলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের এক সভায় ঘোষণা করলেন-" আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয় হিন্দুদের বিররুদ্ধে।"[২৪] প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ১৬ই আগস্টের "এ দিনটি ছিল প্রত্যুত নরমেধ যজ্ঞ। কোলকাতায় ঘটে ভয়াবহ দাঙ্গা; যার সূত্রপাত ঘটে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার মাধ্যমে। দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে এ প্রবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ৪ দিন স্থায়ী হয়। এতে ৫ থেকে ১০ হাজার নর নারী বৃদ্ধ শিশু নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হয়। আহত হয় প্রায় ১৫ হাজারের মত। কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুট সহ নারীর সম্ভ্রম হানীর বহু ঘটনা ঘটে।[২৫]

এ দাঙ্গা প্রসঙ্গে লিওনার্দ মোজলে তার 'বৃটিশ ভারতের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "দাঙ্গা শুরুর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে মহানগরী কোলকাতার উপর নেমে আসে মৃত্যু ও নৈরাজ্যের এক বিষন্ন ছায়া। .....নর্দমা গুলো মানুষ আর গবাদি পশুর মৃতদেহ ধারণ করতে পারছিলনা। শকুনরা পরম তৃপ্তি ভরে তাদের উদর পূর্ণ করছিল এ সব মরা লাশ খেয়ে।"[২৬] কলকাতার দাঙ্গার ঘটনার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পাবনা, ঢাকা, কুমিল্লা, ইত্যাদি জেলাতে দাঙ্গা শুরু হয়। ২৯শে আগস্ট পূর্ব বাংলার নোয়াখালীতে শুরু হয় ভীষণতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ দাঙ্গায় প্রায় ৫ হাজারের উপর লোক নিহত হয় এবং হিন্দুদের ধর্মান্তরণ ও হিন্দু নারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার করা হয়। মুসলীমলীগ সরকার এ দাঙ্গার খবর প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রকাশ হতে দেয়নি। "এক হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৫০ হাজার নরনারী এ দাঙ্গায় প্রভাবিত হয়। কোলকাতার দাঙ্গা সহজে নিয়ন্ত্রণে এলেও; নোয়াখালীর এ দাঙ্গা দীর্ঘ দিন চলে।"[২৭]

কোলকাতা ও পরে পূর্ব বাংলার নোয়াখালীর এ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভীষিকা দেখে দেয়। এ সময় মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে ছিলেন। নোয়াখালীর দাঙ্গা সম্পর্কে বৃটেনের পার্লামেন্টে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর মিঃ আর্থার হেন্ডারসন বলেন- "..that the dead in the Noakhali and contiguous Tippera districts had not yet been counted but 'will', according to estimates, 'be low in the three figures category.' The Bengal government put the number of casualties at 218; some

---

[২৩] Sucheta Mahajan, Independence and partition, p-242
[২৪] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৫১
[২৫] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৫৯
[২৬] কঙ্কর সিংহ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৫০
[২৭] শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

families, however, had their victims out of fear. Over ten thousand houses were looted in the two districts. In Tippea 9,895 person were forcibly converted to Islam; in Noakhali Inexact data suggested that number of converts was greater. Thousand of Hindu women were abducted and married to Moslems against their will..... To convert Hindu women Moslems broke their 'bangles' and removed the 'happiness mark' on their foreheads which showed they were not widows. Hindu men were compelled to grow beards, to twist their lioncloths the Moslem instead of the Hindu temples desecrated. Worst of all, Hindus were made a slaughter their cows if they had any or, in any case, to eat meat. It was felt that the Hindu community would not accept back into its fold one who had killed a sacred beast or partaken of its Flesh."[২৮]

নোয়াখালীর দাঙ্গার এ বিভৎসতার সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি দ্রুত শান্তি মিশন নিয়ে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর কলকাতা থেকে পূর্ববাংলার দাঙ্গা পীড়িত নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ৮ই নভেম্বর নোয়াখালীর চৌমুহনী রেলস্টেশনে গান্ধীজী পদার্পণ করেন। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন ঘটাতে তিনি বদ্ধ পরিকর; ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মিলন সাধনায় তিনি নিমগ্ন হলেন তাঁর অহিংস, সত্যাশ্রয়ী মানবতার মন্ত্র নিয়ে। ৫ই ডিসেম্বর নোয়াখালীতে তাঁর মিশন সম্পর্কে বলেন-" My present mission is the most difficult and completed one of my life..... I am prepared for any eventuality. "Do or Die" has to be put to the test here. "Do" here means Hindus and Mussulmans should learn to live together in place and aminity. Other wise, I should doe in the attempt."[২৯]

৭৭ বছর বয়সে তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে মানুষের সম্প্রীতি ও মানবতা রক্ষার লক্ষ্যে নোয়াখালীর ৪৯ টি গ্রামে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করেন। নারায়ণপুর গ্রামে একজন মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা করলে গান্ধীজী তাদের ধন্যবাদ জানান। গান্ধীজী স্থায়ী কর্ম কেন্দ্র স্থাপন করেন শ্রীরামপুর গ্রামে। তিনি নোয়াখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিদিন সকালে ৩ থেকে ৪ মাইল হেটে জনগনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের কাজে ব্যস্ত থাকেন। "On 17 January the newspapers stated that during the last six days Gandhi had been working twenty hours out of twentyfour. He had spent

[২৮] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-450
[২৯] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-448

Dhaka University Institutional Repository

each of those days in adifferent village and the people were flocking to his hut for advice, comfort and confessions."[৩০]

গান্ধীজী বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনা সভার আয়োজন করে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মর্মবাণী ব্যাখ্যা করে তিনি হিন্দু মুসলমানের সাম্যের বাণী ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথা প্রচার করেন। মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার শুভ বুদ্ধির উদয় হতে থাকে। গান্ধীজীর এক মুসলমান শিষ্যা মিস আমাতুল সালাম মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের উপর নির্যাতন রোধ করার জন্য অনশন করেন। তাঁর প্রার্থনা সভায় ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে লোক সমাগম বাড়তে থাকে।" Five thousand persons came to his prayer meeting on 22 January in the village of Paniala where, several weeks earlier, a large intercommunity dinner had taken place with Hindus, Moslems and untouchables sitting shoulder to shoulder."[৩১] ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ ই নভেম্বর হতে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ পর্যন্ত প্রায় ৪মাস নোয়াখালীতে গান্ধীজী একটানা অবস্থান করেন এবং এখানেই তাঁর ৭৭তম জন্ম বার্ষিকী পালন করেন। শান্তির জন্য নোয়াখালীতে মহাত্মার অবস্থানকে তখন অনেক উল্লেখ যোগ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমালোচনা করেছিলেন; কিন্তু গান্ধীজী তাঁর কর্মে অটল থেকেছেন।

নোয়াখালীর ব্যপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে- 25 October was declared 'Noakhali Day'. Speeches by congressmen and sensational newspapers headlines whippe the Hindus into hysteria and thousands paraded the streets and country lanes shouting 'Blood for blood' In the next week, 'the number of persons officially verified as killed by riots, wrote the Delhi correspondent of the London Times, was 4,580.... They are preponderantly Moslem.[৩২] বিহারে ২৫শে অক্টোবর প্রথমে ছাপরায় পরে পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া, সাঁওতাল পরগণা জেলায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠে। এ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রধানতঃ মুসলমানরা। রাজ্যের চীফ সেক্রিটারীর নথি অনুযায়ী বিহারের দাঙ্গার মৃতের সংখ্যা ২৬৫৫ তবে পুলিশের গুলিতে নিহত এবং যে সব লাশ নদীতে ভেসে গেছে তার হিসাব নিলে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি হবে।[৩৩]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এ ভয়াবহতম ঘটনার সংবাদ পেয়ে মহাত্মা গান্ধী নেহেরুকে লিখলেন- "The news from Bihar has saken me.....if even half of what one hears is true, it shows that Bihar has forgotten humanity....My inner voice tells me. You may not live to be a witness to this senseless slaughter..Does it

---

[৩০] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-453
[৩১] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-454
[৩২] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-447

Dhaka University Institutional Repository

not mean that your day is over?."[৩৪] ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ নোয়াখালী থেকে বিহারের দ্রুত দাঙ্গা কবলিত অঞ্চলে যান তার শান্তি মিশন নিয়ে। তিনি এ দাঙ্গাকে কংগ্রেসের দূর্বলতার দোত্যক বলে মন্তব্য করেন।

বিহারের দাঙ্গা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী দুঃখ করে বলেন "এমনকি হিংসার কারণেও এ জাতীয় হত্যাকান্ড সমর্থন যোগ্য নয়।", He addressed a manifesto to the Biharis: "Bihar of my dreams seems to have falsified them..... The misdeeds of the Bihari Hindus may justify Qaid-e-Azam Jinnah's taunt that the Congress is a Hindu organization in spite of its boast that it has in its ranks a few Sikhs, Moslems, Christians, Parsis and others.....let not Biher, which has done so much to raise the prestige of Congress, be the first to do its grave.

As penance, Gandhi announced, he would keep himself on the lowest diet possible; and this would become a fast unto death if the erring Biharis have not turned over a new leaf."[৩৫]

সংবাদ পেয়ে দ্রুত নেহেরু, প্যাটেল, লিয়াকত আলী খান এবং আব্দুর রব নিস্তার দিল্লী থেকে উড়োজাহাজে বিহারে চলে এলেন। নেহেরু বিহারের হিন্দুদের হুঁশিয়ার করে দিলেন যে, দাঙ্গা বন্ধ না হলে তিনি প্লেন থেকে বিহারে বোমা বর্ষণ করবেন। "জওহরলাল নেহেরু এবং বল্লভ ভাই প্যাটেল গান্ধীজীর কাছে এই ভিক্ষা চাইলেন যে, বিহারের ঘটনায় গান্ধীজী যেন আমরণ অনশন এর সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন, কারণ জাতির জন্য তাঁর প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী।"

মহাত্মা সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খানকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের বিভিন্ন জনপদে ঘুরে ঘুরে মিলনের বাণী প্রচার করেছেন এবং অনেক দিন সেখানে অবস্থান করেছেন, প্রার্থনা সভা সহ বিভিন্ন ধর্মের মর্মবাণী প্রচার করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য। গান্ধীজী বলেন-" I must not leave Bihar till we see light.. As for myself I will never allow any repetition of communal massacre anywhere on this earth. I have suspended all my engagements and I will go form village to village in Bihar to prevent communal riots... In case any man seeks to kill his compatriot , he will have to murder Jawaharlal first and then by trampling over his corpse, he would be able to satisfy his last for blood."[৩৬] মহাত্মার সম্প্রীতির আহবানে আস্তে আস্তে বিহারের দাঙ্গা থেমে যায়।

---

[৩৪] গোপাল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দাঙ্গার ইতিহাস, পৃ-৬৪

[৩৫] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-447

[৩৬] Louis Fischer, Mahatama Gandhi the Pligrim of Noakhali, p-447

[৩৭] Sucheta mahajan, Independence and Partition, p-250

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ইতোমধ্যে পুরো উপমহাদেশ ব্যাপী প্রত্যেক দিনই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে যাচ্ছিল। দাঙ্গার আগুনে পুরে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির বদলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উগ্রতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এ সময় গুলোতে গান্ধীজীর কর্মপন্থা সম্পর্কে প্রফেসর এন, কে বোস বলেন-"The first thing is that politics has been divided us in to Hindus and Muslims. I want to rescue people from this quagmire and make them work on solid ground, where people are people. Therefore my appeal here is not to the Muslims as Muslims, nor Hindus as Hindus, but to ordinary human beings who have to keep their villages clean, build schools for their children, and take many other steps so that it can make life better.[৩৭]

কোলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারের পর বোম্বাইতে দাঙ্গা হলো। পাঞ্জাব এ পর্যন্ত শান্ত ছিল সেখানেও সংর্ঘষ ও অশান্তির আভাস দেখা দিল। "২রা মার্চ মালিক খিজির হায়াৎ খান পাঞ্জাবের মুখ্য মন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ৪ঠা মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে পাকিস্তান বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হল যার ফলশ্রুতিতে ১৩ জন মৃত্যুবরণ করল এবং আহত হলো অনেকে। সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ল এবং অমৃতসর, তক্ষশীলা ও রাওয়ালপিন্ডিতে ব্যাপক গোলযোগ হলো। সাম্প্রদায়িক আবেগ যতই তীব্রতর হচ্ছিল অন্যদিকে প্রশাসন শিথিল হয়ে পড়ছিল।"[৩৮]

ছিন্নমস্তা বৃত্তির উৎকট অভিব্যক্তির ঐ দিন গুলোতে ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করার সাধনায় গান্ধীজী ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লীতেই ছিলেন। তিনি কখনও দেশ বিভাগের পক্ষে ছিলেন না; ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশ বিভাগকে তিনি সব সময় বিরোধীতা করেছেন। *লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন* এর কৌশলে যখন সর্দার প্যাটেল ও জওহরলাল নেহেরু দেশবিভাগের সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন; মাওলানা আজাদ ছিলেন তখন এর ঘোরে বিরোধী। আজাদ এ সময় গান্ধীজীর অভিমত জানতে চাইলে "গান্ধীজী বলেন, কোন প্রশ্নই আসে না। যদি কংগ্রেস দেশ বিভাগ মেনেও নেয় আমি ভারত বিভাগের ব্যাপারে কখনও রাজী হব না।[৩৯] এ প্রসঙ্গে শংকর ঘোষ লিখেন, " But Gandhi continued to condem Pakistan. 'vivisect me,' he said, ' before you vivsect India. ' You should not what even the Moghuls who ruled over India for over two centuries did not do.'Gandhi decleared that he would refuse to subscribe to this 'Un-Islamic demand.....(though you) may cut me to pieces.[৪০]

---

[৩৭] B.R Nanda, Mahatma Gandhi-125 Years, Gandhi and Religion, p-146
[৩৮] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া ইউনস ফ্রিডম, পৃ-২২৩
[৩৯] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি) ইন্ডিয়া ইউনস ফ্রিডম, পৃ-২৩১
[৪০] Sankar Ghose, Mahatma Gandhi, p- 313

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেনি। পৌনঃপুনিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং নেতাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মদদে মানুষের মানবতা ও প্রীতির বন্ধন ভেঙ্গে ভারতবর্ষকে একবারে বিষাক্ত করে তুলেছিল। যে কারণে তাঁকে দেশ ভাগে সম্মতি দিতে হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুনের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের উত্থাপিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার মাধ্যমে তিনি দেশ ভাগের পক্ষে মত দেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ভারত ভাগের পক্ষে কথা বললেও তিনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোষ করেননি। অসাম্প্রদায়িক চেতনার পূজারী মহাত্মা গান্ধী সম্প্রীতির বাণী ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বার্তা নিয়ে উপমহাদেশের প্রতিটি জনপদে ঘুরেছেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট দাঙ্গা কবলিত লাহোর ও পাঞ্জাবে শান্তি মিশন নিয়ে গমন করেছেন প্রায় ৮০ বছর বয়সে।

'লর্ডমাউন্ট মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা' বা '৩রা জুন পরিকল্পনার' পর ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুটো রাষ্ট্র তৈরীর দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পৌনঃপুনকিতা ততই বেড়ে যাচ্ছিল। "সমগ্র সময়টা জুড়ে গান্ধীজী তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং মুসলমানদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার আশানুরূপ ফল না হওয়ায় তিনি ভীষণ দুঃখ ও যাতনা ভোগ করতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আজাদ উল্লেখ করেন, "প্রায়ই তিনি জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল ও আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং শহরের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে বলতেন। তিনি যখন দেখতেন সঠিক কি ঘটছে সে ব্যাপারে আমাদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে তখন তাঁর যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেত।"[৪১]

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭সাল ভারত ডোমিনিয়ন জন্মলাভের দিন স্বাবস্থ্য হলো। দেশ বিভাগের দিন নোয়াখালীবাসীর পাশে থাকার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী যাত্রা পথে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন ৯ই আগস্ট। তিনি দেখলেন কোলকাতার সংখ্যালঘু মুসলমানরা ভীত স্বন্ত্রস্থ, ইতোমধ্যে ট্রেন থামিয়ে ১২ জন লোককে দিবা লোকে হত্যা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান তখনও থেমে থেমে জ্বলছে। "১০ই আগস্ট কলকাতার প্রার্থনা সভায় গান্ধী বললেন যে, মানুষের বর্বরতা দেখে তাঁর মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচেছ। তিনি বললেন এই ঘটনা গুলোকে গুন্ডামী বলে খারিজ করে দেওয়া বাতুলতা।"[৪২]

বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ১১ই আগস্ট সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজীর সাথে দেখা করে উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসটিতে কলকাতায় থাকার অনুরোধ করলেন। গান্ধী রাজী হলেন, তবে শর্ত দিলেন প্রাসাদে নয়, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবনা তৈরীর লক্ষ্যে সশস্ত্র রক্ষী বিহীন তিনি এবং সোহরাওয়ার্দী একত্রে দাঙ্গা প্রবণ উপদ্রুত এলাকায় গিয়ে একত্রে বাস করবেন। প্রধান মন্ত্রী রাজী হলেন। গান্ধীজী সোহরাওয়ার্দীসহ সাধারণ নাগরিক হিসাবে কোলকাতার দাঙ্গা প্রবণ অঞ্চল বেলে

---

[৪১] মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৪৬
[৪২] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘাটায় 'হায়দরী ম্যানসন' নামে এক মুসলমান বাড়ীতে এসে উঠলেন ১৩ই আগস্ট। চারিদিকে প্রবল দাঙ্গা "গান্ধীজীর আসার পর একদল আগ্রাসী হিন্দু বাড়ীটির দরজা জানালা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বৃষ্টির মত বর্ষিত হতে থাকল ইঁট পাথর। সেই হিন্দুরা গান্ধীর কাছে জানতে চাইলেন, "আপনি কেন মুসলমানদের বাচাঁতে এসেছেন? ক্ষতি গ্রস্থতো হয়েছে হিন্দুরা?" শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ইঙ্গিত করে তারা আরো বললেন, "যে ব্যক্তিটি অগণিত হিন্দুর মৃত্যু ও দুর্দশার কারণ, আপনি তাঁকে কেন সঙ্গী করেছেন?.....মহাত্মা গান্ধী উত্তরে বললেন- "আমি জন্মেছি হিন্দু হয়ে; বিশ্বাসের দিক দিয়েও হিন্দু আমি কি করে হিন্দুদের শত্রু হতে পারি?" তিনি আরো বললেন যে, বিদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা এবং এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব যা নিরর্থক তাকে বিলোপ করতেই তিনি চেষ্টা করছেন।" লোকগুলো প্রবোধ পেয়ে চলে গেল।"[৪৩]

১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল । এক সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের সময় গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় তিন থেকে চার হাজার হিন্দু মুসলমান একত্রে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নজীর স্থাপন করলেন। এসময় কোলকাতা শুধু শান্তই থাকল না; গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে অবিশ্বাস্য মিলন মেলা তৈরী করলেন তাহা দেখে সকলেই তাজ্জব। 'দি স্টেটস ম্যান' পত্রিকা ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট ঈদের দিনে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় স্বতস্ফূর্ত বিপুল জনসমাগম দেখে অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে মন্তব্য করলেন-"অবিস্মরনীয় সাম্প্রদায়িক মিলন"। পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর রাজা গোপালচারী মহাত্মাকে সম্বোধন করলেন- "যাদুকর"। Gandhi was pleased. 'We drunk the poision of hatred', he said,"and so this nectar of fraternization tastes all the sweeter.'[৪৪]

গান্ধীজীর এই অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার সাফল্যে ২৬ শে আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন মহাত্মাকে টেলিগ্রাম পাঠালেনঃ My dream Gandhiji, in the Panjab we have 55 thousand soldiers and large scale rioting on our hands,. In Bengal our forces consist of one man and there is no rioting. As a serving officer, as well as an administrator may I be allowed to pay my tribute to the One Man Boundary Force."[৪৫] সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার সাফল্যে ১৯৪৭ সালের ২৪শে আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে মুসলিমলীগ এই প্রস্তাব গ্রহন করলঃ "মিঃ গান্ধী যে ভাবে কোলকাতার সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন তাঁর সেই ভূমিকার জন্য আমরা অন্তর থেকে তাঁর প্রশংসা করছি।"[৪৬]

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মাকে দিল্লীতে চলে আসতে আহবান করলেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭সাল যাত্রার দিন ধার্য্য হলো। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল, পশ্চিম ও পূর্ব

---

[৪৩] রশিদ করিম, একলা চলোরে, দৈনিক বাংলার বাণী ,ঢাকা, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২ইং।

[৪৪] B. R Nanda, Gandhi and her Critics, The partition Massacres, p-107

[৪৫] B. R Nanda, Gandhi and her Critics, The partition Massacres, p-107

Dhaka University Institutional Repository

পাঞ্জাবে হিন্দু,মুসলমান ও শিখরা মিলে স্বাধীনতা উত্তর উপমহাদেশে ভয়াবহতম পৈচাশিক সাম্প্রদায়িক হানাহানীর শক্তি পরীক্ষায় মত্ত হলো। পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের এ দাঙ্গার ঘটনার সংবাদ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতাতে ও জ্বলে উঠল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। বেলেঘাটার সেই 'শান্তি মন্দির' হায়দারী ম্যানসনও জ্বলে উঠল হিংসার অনলে। রশিদ করিম তাঁর প্রবন্ধে লিখেন, " ৩১শে আগস্ট একদল উত্তেজিত হিন্দু জনতা এখানে এসে গান্ধীজীর সামনে বিষোদগার করতে শুরু করলেন। লোকগুলোর কাধে গুরুতরভাবে আহত এক হিন্দু এবং তারা বললেন, মুসলমানরা তাকে ছুরি মেরেছে। গান্ধী তাদের শান্ত করতে চেষ্ঠা করলেন; কিন্তু বৃথা সে চেষ্ঠা। উত্তেজিত লোকগুলো হায়দারী ম্যানসনে চড়াও হয়ে এলোপাথারী আক্রমণ করলেন। তারা গান্ধীজীকে লাথি দেখালেন, ইট ছুরে মারলেন গান্ধীজী নিজেই আহত হলেন।..... সন্ধ্যা আসার আগেই ৫০জন নিহত ৩০০জন আহত হলো.....গান্ধীজী উপদ্রুত অঞ্চল গুলোতে সোহরাওয়ার্দীকে সাথে করে শান্তি মিশন নিয়ে ঘুরতে থাকলেন।[৪৭]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেড়েই চলছিল। গান্ধীজী অনশনের সিদ্ধান্ত নিলেন।.. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে (মুসলমানদেরকে) এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখে রেখে দিতে পারিনা। আমার অনশন এখনই শুরু করতে হবে। কলকাতাকে যদি বাচাঁতে পারি, তাহলে পরে আমি পাঞ্জাবেরও মোকাবেলা করতে পারব। দেরী করলে দাবানল সাড়া দেশকে ছারখার করে দেবে। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, "সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আজ ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টা ১৫মিনিট থেকে অনশন শুরু করবো এবং কোলকাতায় শান্তি ফিরে এলেই কেবল ভাঙ্গবো। নতুবা আমৃত্যু চলবে।"[৪৮]

অনশনের এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর ৩রা সেপ্টেম্বর হিংসায় উন্মত্ত কোলকাতা খানিকটা অনুতপ্ত হলো। ক্যালকাটা বার এসোসিয়েশন, হিন্দু মুসলমানের মিলিত জনতা, ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী ও সরকারী কর্মচারীদের এক বিরাট মিছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে একতাবদ্ধ হয়ে গান্ধীজীর কাছে এলো। গান্ধীজী এই মিছিলকে বললেন, যাও তোমরা পথে পথে টহল দিয়ে শান্তি রক্ষা কর; পুলিশকে একটু বিশ্রাম দাও। স্বয়ং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা গান্ধীজীর প্রতি তাদের শান্তির আনুগত্য প্রকাশের জন্য নিজেরাই চব্বিশ ঘন্টার প্রতীক অনশন করলেন। বিভীষিকাময় উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সেই ভয়াল দিনগুলোতে একমাত্র গান্ধীজীই তাঁর মানব প্রেমের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বার্তা নিয়ে স্বয়ং নিজের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে এসছেন। ক্ষমতার স্বার্থের রাজনীতি করেননি। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে তাঁর অবদান নমস্য।

৪ঠা সেপ্টেম্বর শত শত হিন্দু 'প্রতিরোধ বাহিনী'র লোকেরা গান্ধীজীর কাছে এসে অস্ত্র সমর্পন করতে লাগল এবং বলল - মহাত্মা আপনি যে শাস্তি দেবেন আমার তা মাথা পেতে নেবো, কিন্তু আপনি অনশন ভঙ্গ করুন। গান্ধীজী জবাব দিলেন তোমাদের এই শাস্তি দিচ্ছি যে, তোমরা

---

[৪৭] তেফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-২৩৪

[৪৮] রশিদ করিম, একলা চলরে, দৈনিক বাংলার বাণী ,ঢাকা, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২ইং।

[৪৮] রশিদ করিম, একলা চলরে, দৈনিক বাংলার বাণী , ঢাকা, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২ইং।

সকলে মিলে মুসলমানদের পাড়ায় পাড়ায় যাও এবং তাদের অভয় দাও যে, তোমাদের হাতে তাদের জানমাল নিরাপদ; তোমরা যদি হৃদয়ে এই পরিবর্তন ঘটাতে পার, তাহলেই আমি অনশন ভঙ্গ করব। দাঙ্গা শান্ত হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ৬টায় হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট এস, সি চ্যাটার্জী ও সেক্রেটারী দেবেন্দ্র নাথ মুখার্জী, মুসলীমলীগ নেতা ডঃ জি জিলানী, শিখ দৈনিক 'দেশ দর্পন' এর সম্পাদক সরদার এন সিং তালিব প্রমুখরা এলেন শান্তির অঙ্গীকার নিয়ে। সোহরাওয়ার্দী, রাজ্যপাল শ্রী রাজা গোপালাচারী, কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী, মুখ্যমন্ত্রী পি,সি ঘোষ এর উপস্থিতিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত থেকে লেবুর শরবত গ্রহণের মাধ্যমে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। তবে অনশন ভঙ্গের আগে দু'টি প্রতিশ্রুতি তিনি সকল নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে আদায় করে নেন। " আপনারা অঙ্গীকার করুন যে, কোলকাতায় আর কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবেনা এবং যদি হয়ও তাহলে আপনাদের ব্যর্থতা জানাবার জন্য আপনারাও বেঁচে থাকবেন না। শান্তি রক্ষার জন্য তার আগে আপনারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিবেন।"[৪৯] ৩রা সেপ্টেম্বর "দি স্টেটম্যান" পত্রিকা গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী রাজনৈতিক চেতনায় এই প্রথম বারের মত গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করলেন। এর আগে 'দি স্টেটম্যান' মহাত্মা শব্দটি কোন দিনই ব্যবহার করেননি, মিঃ গান্ধী বলেছেন।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার উষালগ্ন উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো, কিন্তু আনন্দ উল্লাস ৪৮ ঘন্টাও স্থায়ী হলো না। পরের দিনই সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সংবাদে রাজধানীতে গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এলো। দেশ বিভাগের শুরুতেই হিন্দু -মুসলমান-শিখ এর রক্তে প্লাবিত হয়ে গেল পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব। "জানা গেল যে, পূর্ব পাঞ্জাবে হিন্দু এবং শিখ জনতা মুসলমান গ্রামগুলো আক্রমণ করছে। তারা ঘর বাড়ী পুড়িয়ে ফেলছিল এবং নিষ্পাপ নরনারী ও শিশুকে মেরে ফেলছিল। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকেও প্রায় একই রিপোর্ট এল। মুসলমানগণ নির্বিচারে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের নরনারী ও শিশুদের হত্যা করছিল। সমগ্র পাঞ্জাব পূর্ব ও পশ্চিম মৃত্যু ও ধ্বংসের সমাধি ক্ষেত্রে পরিণত হল।" [৫০] দাঙ্গার খুনাখুনীর প্রচন্ডতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিওনার্দ মোজলে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়' এ উল্লেখ করেন- "প্রায় দেড় কোটি হিন্দু-শিখ এবং মুসলাম পৈত্রিক ভিটামাটির মায়া ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছিল রক্ত পাগল জনতার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। ঠিক একই সময়ে ছয় লক্ষাধিক মুসলমান, হিন্দু ও শিখ নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়েছিল। একে শুধু হত্যা বলা ঠিক হবে না। এ হত্যাকান্ড ছিল খুবই পাশবিক।[৫১]

একজনের পর আর একজন পাঞ্জাব মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে রাজধানীতে ছুটে আসছিল। সেখানে সেনাবাহিনী পাঠিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিলনা, কারণ দেশ ভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক

---

[৪৯] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-২৩৫

[৫০] মাওলানা আজাদ,(অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৬১

[৫১] রঞ্জয় সিংহ,সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট, পৃ-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে সেনাবাহিনীকে খন্ডিত করায় বাহিনী গুলো সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় টান টান পর্যায়ে ছিল বলে তাদের উপর ভরসা করা যাচ্ছিলনা। পাঞ্জাবের দাঙ্গার নরহত্যার ভীবৎসতা বর্ণনা দিতে গিয়ে ডোমিনিক লেপীয়ার ও লেরী কলিনস তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেন, Indias joyfull independence day was indeed a day of horror for the Punjab..... The slaughtered its male inhabitants without merchy or exception. The women were stripped, repeatedlly raped, then paraded shaking and terrified through the city to the golden temple where most had their throats cut..... He turned back the train. As he did, he saw in great white-washed letters on the flank of the last car the assassins' calling card, ' This train is our Independence gift to Nehru and Patel', it read."[৫২] এসময় শুরু হয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম 'বাস্তুত্যাগ' পর্ব।

পাঞ্জাবের হত্যাকান্ডের সংবাদ প্রচার ও দিল্লীতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আশা শুরু হলে দিল্লীতেও সাম্প্রদায়িক হানাহানী শুরু হয়ে গেল। নগরীতে ঘটতে থাকল প্রচুর হত্যাকান্ড। এ গোলমাল শুধু সাধারণ জনগণ বা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সীমিত থাকলনা। যে সব এলাকায় সরকারী কর্মচারী থাকত সেখানেও দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জীবানু সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করায় সাম্প্রদায়িক অরাজকতা থামাতে সামরিক বাহিনী তেমন কোন কার্যকর ভূমিকাই রাখতে পারছিলনা। *'জিম্মী ও প্রতিশোধ'* গ্রহণের তত্ত্ব দাঙ্গার ভয়াবহতাকে আরো বাড়িয়ে তুলছিল। এ তত্ত্বানুসারে পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ নিধনের জন্য দিল্লীর নিরপরাধ মুসলমান এবং দিল্লীর মুসলমানদের নিধনের জন্য পাকিস্তানের নিরপরাধ হিন্দু ও শিখদের নির্বিচারে হত্যার প্রক্রিয়া ভয়ংকরতম রূপ ধারণ করেছিল।

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভয়াবহ দিন গুলোতে ১৯৪৭ সনের ২র অক্টোবর গান্ধীজী ৭৮তম জন্ম দিবসে পা রাখলেন। সাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমস্ত দিন ব্যাপী প্রচুর লোক বিড়লা হাউসে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলে মহাত্মা নিস্প্রাণ ও ব্যথিত রইলেন। বিগত সময়ে গান্ধীজী বলতেন- "Believe me, my friends, I am not anxious to die. I want to live my full span of life. According to me, it is 120 years at least. by that time India will be free, the world will be free."[৫৩] অথচ আজকের জন্ম দিনে তাঁর বক্তব্য ছিল অন্য রকম, "I have lost all desire to live long, Let alone125 years... I can not live while harted and killing mar the atmosphere.' The birth day celebrations depressed him. ' Where do congratulations com in?' the

---

[৫২] Dominique Lapierre and Larry Collins, Freedom at Mid Night, p-341.
[৫৩] D. G Tendulkar, Mahtma, Life of Mohandas Karam chand Gandhi,Vol-6, p-166

Dhaka University Institutional Repository

Mahatma asked.'Would it not be more appropriate to send condolences?'[৫৪] অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশে আত্মবলিদানকারী পূজারী ইনিই মহাত্মা।

সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যতই বাড়ছিল গান্ধীজীর বিষাদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতার বাণী নিয়ে পাকিস্তানের শান্তি মিশনের নিজ দূত হিসাবে লীগের প্রথম সারির দুই নেতা সুরাবর্দী ও খালেকুজ্জা খাঁ কে এ সময় মহাত্মা মিঃ জিন্নাহ্‌র নিকট পাঠান। "তাঁর ইচছার প্রতি সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো যখন কোন সাড়া দিচ্ছিল না তখন তিনি মাওলানা আজাদকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, দিল্লীতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অনশন করা ব্যতীত তাঁর আর কোন অস্ত্র নেই।"[৫৫]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কূটচালের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী থেকে দিল্লীর 'বিড়লা হাউস' এ অনশন শুরু করলেন। এটা ছিল গান্ধীজীর ভাষায় 'My Greatest Fast'. সে তাঁর এক শিষ্যকে লিখলেন- 'এটাই সর্বশেষ এবং দিল্লীতে শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত অনশন ভাঙ্গা হবে না।'[৫৬] তখন তাঁর বয়স ৭৮ বছর। প্রথম অনশনের দিন সন্ধ্যায় জওহরলাল নেহেরু, মাওলানা আজাদ ও বল্লভ ভাই প্যাটেল গান্ধীজীর কাছে ছিলেন। প্যাটেল তখন ভারতের স্বারষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তিনি গান্ধীজীকে এ অযৌক্তিক ইস্যু বিহীন অনশন ভঙ্গ করতে বললেন। গান্ধীজী চিরাচরিত প্রশান্ত ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন- "আমি এখন চীনে নই, দিল্লীতে। আমি আমার নিজের চোখ আর কানকেও হারাইনি। তুমি যদি আমার কান ও চোখের স্বাক্ষ্যকে অবিশ্বাস করতে বল, এবং বল যে, মুসলমানদের অভিযোগ জানানোর কোনই কারণ নেই তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারবনা বা তুমিও আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।"[৫৭] মহাত্মার মত একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার পূজারীর ক্ষেত্রেই এ কাজ সম্ভব। যিনি নিজের প্রিয় শিষ্য, সংগঠন ও ধর্মীয় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণের জন্য ভিন্ন ধর্মালম্বীদের পক্ষে ৭৮ বছর বয়সেও বিদ্রোহ করতে পারেন। নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারেন শুধু অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার ধারাকে বেগবান করার জন্য। মহাত্মা গান্ধীর মত এমন সক্রিয় অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশ্ব ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

যে মুহূর্তে জানাজানি হয়ে গেল গান্ধীজী তাঁর অনশন শুরু করেছেন। সে মুহূর্তে শুধু দিল্লী নয় সাড়া ভারতবর্ষ আলোড়িত হল এবং প্রতিক্রিয়া হল বিদ্যুতের মত। বি, আর নন্দার কথায়- "Gandhi's fast had a refreshing effect upon Pakistan; it punctured the subtle web of Muslin League propaganda which for ten years had painted

---

[৫৪] Yogesh Chadha, Rediscovring Gandhi, p-446

[৫৫] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৬৮

[৫৬] B. R Nanda, Gandhi and her Critics, The Partition Massacres, p-109

[৫৭] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৭০

Dhaka University Institutional Repository

him as an enemy of Islam."[৫৮] গান্ধীজীর বিছানা বিড়লা হাউসের বাগানে স্থানান্তর করা হয়েছিল যেখানে তিনি তাঁর প্রথম আহার গ্রহণ করেছিলেন।

বাগানে এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি হলো। রবার্ট পাইন তাঁর গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখেন, "This was followed Buddhist prayers, Muslim and Paris prayers, his favourite hymn Vaishanva Jan, and then Dr. Sushila Nayyar sang " When I survey the wondrous cross." and finally there were devotional readings from the Koran, the holy book of the Sikhs and Hindu writings. There was a atmosphere of gloom. From time to time Gandhi talked about death in a way which did nothing to dispel the gloom."[৫৯] বিকালে তিনি প্রার্থনা সভায় যোগ দিলেন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাণী প্রচার করে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সম্প্রীতির কথা বললেন। গান্ধীর অমূল্য প্রাণ কিছুতেই ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। যে কোন মূল্যে তাঁকে বাঁচাতে হবে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে অসংখ্য লোক গান্ধীজীর কাছে আসতে লাগল। এমনকি সেদিন পর্যন্ত যেসব গোষ্ঠী প্রকাশ্যে গান্ধীজীর বিরোধীতা করছিল তারাও এগিয়ে এলো। গান্ধীজী অনশনে অটল রইলেন। এদিকে তাঁর শরীর ক্রমশ দূর্বলতর হচ্ছিল।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য নেহেরু জনসভা করলেন। সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবনা ও বন্ধুত্বের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে আহবান করা হলো এমন কর্মসূচী নিতে যাতে গান্ধীজীর কাছে গ্রহণ যোগ্য হয় যে, সেটা সম্প্রীতি নিশ্চিত করবে। এদিকে হিন্দু-মুসলিম-শিখ একতার জন্য মিছিল করল সাধারণ জনগণ।"পাতিয়ালার মহারাজার শিখ রাজপুত্র এসে গান্ধীজীকে আশ্বস্ত করলেন যে দিল্লীর সমস্ত শিখদের তিনি মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি পূর্ন সহাবস্থানের নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে বিষয়টি কার্যকর কারার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এদিকে গান্ধীজীর নিকট এলেন মালহারের নবাব, যিনি একজন মুসলমান রাজপুরুষ। তিনি গান্ধীজীকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তার রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের জন্য তিনি এমন ব্যবস্থা নিয়েছেন যেখানে একজন শিখ বা হিন্দু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারালে তিনি ১০ জন মুসলমানকে গুলি করে হত্যা করবেন। গান্ধী আর্শীবাদ জানালেন।"[৬০] ঐ দিন সন্ধ্যায় আলবুখারিক রোডে এক বিরাট শোভাযাত্রা হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে। তাঁদের শ্লোগান ছিল" হিন্দু মসলিম ভাই ভাই" আর "মহাত্মা গান্ধী কি জয়"। লর্ড এবং লেডী মাউন্ট ব্যাটেন এলেন গান্ধীর নিকট। তিনি তাদের শীর্ণ হাতে অভিবাদন জানালেন এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন " It takes a fast to bring in to me."

অসংখ্য লোক এসে গান্ধীজীকে বললেন দিল্লীতে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তারা সকলে এক যোগে প্রাণান্ত পরিশ্রম করবেন তবু গান্ধীজী যেন অনশন ভঙ্গ করেন। মহাত্মা তাদের কথায় প্রভাবিত হলেন

---

[৫৭] B. R Nanda, Gandhi and her Critics, The Partition Massacres, p-109
[৫৮] Robert Payen, The Life and The Death of Mahatma Gandhi, p-559
[৫৯] Robert Payen, The Life and The Death of Mahatma Gandhi, p-564

Dhaka University Institutional Repository

না। লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে গান্ধীজী বললেন, " He would fast not for the peace of Delhi, but for the honour of India."[61] সকলের অনুরোধে গান্ধীজী কয়েকটি শর্তের বিনিময়ে অনশন ভঙ্গ করার জন্য রাজী হতে চেয়েছিলেন; এ শর্ত গুলো জানার জন্য সকলের সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মহাত্মার কাছে গেলেন। গান্ধীজী শর্ত দিলেন- 'হিন্দু ও শিখদের আক্রমণের কারণে যে সব মুসলমানকে দিল্লী ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে তাদেরকে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানাতে হবে এবং তাদের অবশ্যই নিজ নিজ গৃহে পুনর্বাসিত করতে হবে।'

শর্ত শুনে মাওলানা আজাদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এ শর্ত পালন সম্ভব নয়। অবশেষে অনেক ভেবে তিনি মহাত্মাকে যুক্তি দেখালেন যে, ইতিমধ্যে অনেকেই বাড়ীঘর ছেড়ে ঠিকানাহীন গন্তব্যে অনত্র চলে গেছে, আবার অনেকে নিজেদের ভিটা ত্যাগ করে অনত্র থেকে পরিত্যাক্ত বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এমতাবস্থায় সকলকে খুঁজে বের করে নিজ নিজ পূর্বাবস্থানে পুনর্বাসন করে পুরাপুরি ভাবে শর্তটি পালন সম্ভব নয়; বরং যারা উপস্থিত আছেন তাদের শান্তির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। তিনি এ শর্তটি বাস্তবতার নিরীক্ষে পালন ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে গান্ধীজীকে বুঝাতে সক্ষম হলেন। গান্ধীজী মাওলানা আজাদের কথায় রাজী হলেন। তবে তিনি অন্য কতগুলো শর্ত দিলেন, যেগুলো পূরণ ছাড়া তিনি আমরণ অনশন করবেন। শর্ত গুলো হলো- গান্ধীকে সবার নিশ্চয়তা দিতে হবে যে,

ক) দিল্লীতে হিন্দু মুসলামান শিখ পূর্বের মত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে ভাইয়ের মত একসাথে বসবাস করবে। মুসলমানদের সম্পত্তি, বিশ্বাস ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দিল্লীতে ঘটে যাওয়া দূর্ঘটনা কখনও পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।

খ) বিগত বছরগুলোর ন্যায় খাজা কুতুবউল দীন এর ওরশ এবারও ভালভাবে উদ্‌যাপিত হবে। ক্ষতি গ্রস্থ মাজার, দরগা শিখ ও হিন্দুরা নিজেরা সংস্কার করবে সরকারী সহায়তা ছাড়া।

গ) মুসলমানরা সাবজিমান্ডী, কেরল, ফারাগঞ্জ এবং অন্যান্য লোকালয়ে এখন থেকে চলাচল করতে পারবে যেটা অতীতে পারত না।

ঘ) হিন্দু এবং শিখ দ্বারা দখলকৃত মুসলমানদের ফেলে যাওয়া মস্‌জিদ ফেরত দিতে হবে এবং মুসলমানদের এলাকা জোর পূর্বক দখল করা যাবেনা।

ঙ) দিল্লী থেকে চলে যাওয়া মুসলমানরা ফিরে আসলে অবশ্যই তাদের ব্যবসা পূর্বের মত নির্বঘ্নে নিজেরা পরিচালনা করতে পারবে।

চ) সম্প্রীতির জন্য সকল কাজ পুলিশ ও মিলিটারী ছাড়া হৃদয়ের টানে করতে হবে।

ছ) এই ইস্যুতে মহাত্মাকে আর কোন দিন অনশন করতে হবে না।[৬২]

শর্তগুলো জানার পর দিল্লীতে এক বিশাল জনসভায় মাওলানা আবুল কালাম আজাদ শর্তগুলো উপস্থাপন করলেন এবং বললেন- "গান্ধীজীর জীবন বাঁচাতে হলে এ শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ ও

---

[61] Dominique Lapierre and Larry Collins, Freedom at Midnight, p-471

Dhaka University Institutional Repository

মানার অঙ্গীকার করতে হবে।" উপস্থিত জনতাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো জনগণ গান্ধীজীর এ শর্ত গুলো মানবেন কি না? বলার সাথে সাথে " প্রায় বিশ হাজার নরনারী সমস্বরে তারা চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমরা গান্ধীজীর ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমরা আমাদের জীবন ও হৃদয় বাজী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি যে, তাঁর দুঃখের কোন কারন আর ঘটতে দেবনা।"[৬৩] সভা শেষ হতে না হতে হাজার হাজার লোক শর্ত পালনের অঙ্গীকার নামা দলিলটিতে স্বাক্ষর করল এবং তৎকালীন দিল্লীর ডেপুটি কমিশনার রণধাওয়া একদল হিন্দু ও শিখ নের্তৃবৃন্দকে নিয়ে 'খাজা কুতুব উল দ্বীন' এর মাজার সংস্কার করতে চলে গেলেন। পরের দিন সকালে দিল্লীর নের্তৃস্থানীয় প্রতিনিধিবর্গ এক সভা করে বিড়লা হাউসে গিয়ে গান্ধীজীকে শর্ত পূরণের আশ্বাসের কথা বললে তিনি খুশী হলেন এবং প্রতিটি প্রতিনিধির কথা শুনে পরের দিন উত্তর দিবেন বলে অনশনে মগ্ন রইলেন।

১৭ই জানুয়ারী রাজেন্দ্র প্রাসাদের বাড়ীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মোট একশত ত্রিশ জন প্রতিনিধির এক সম্মেলন হলো। পরিস্থিতির মূল্যায়ণ ও গান্ধীজীর অনশন ভঙ্গ করার জন্য সভায় সবাই যে কোন মূল্যে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে একমত হলেন। এ প্রস্তাবনায় মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন 'হিন্দু মহাসভা' ও 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ' ও উপস্থিত হয়ে গান্ধীর জীবন বাচাঁতে চুক্তিতে সই করলেন।

পরের দিন ১৮ই জানুয়ারী ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ। সকাল দশটায় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং পুরো মন্ত্রীসভা (প্যাটেল বাদে) এবং পাকিস্তানের হাইকমিশনার শহীদ হোসেন গান্ধীজীর উত্তর শোনার জন্য সেখানে সমবেত হলেন। গান্ধীজী বললেন, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ যদি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে চান তবে তারা যেন তা করেন। হিন্দু ও শিখ রাজনৈতিক স্কুলের প্রতিনিধি ও অন্যান্য সহ মোট পচিঁশ জন নেতা তাদের অঙ্গীকারের শপথ উচ্চারণ করলেন। তারপর গান্ধীজী বললেন- "I will break the fast.God's will be done. All of my well be a witness to it."[৬৪] গান্ধীজীর ইশারায় নরনারীগণ রামধূন গাইতে লাগল। প্রার্থনা সভা হলো। গান্ধীজীর নাতনী মনু গান্ধী নিয়ে এল এক গ্লাস কমলার রস। মাওলানা আজাদের হাতে কমলার রস পান করে দুপুর ১২টা ২৫মিনিটে মহাত্মা অনশন ভঙ্গ করলেন। সাথে সাথে উপস্থিত প্রায় একশত প্রতিনিধি সাম্প্রাদয়িক মেলবন্ধনে সকলকে কমলা ও কলা দ্বারা আপ্যায়িত করা হলো। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার নির্মল শান্তির বারিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ত আগুন নিভে গিয়ে উদ্‌যাপিত হলো ভ্রাতৃত্বের রাখি বন্ধন উৎসব।

প্রত্যয় সৃষ্টিতে গান্ধীজীর মত সম্মোহনী (Charismatic) ক্ষমতার ব্যক্তিত্ব উপমহাদেশে ছিল বিরল। শুধু নিজে অনশন এবং বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নয়। মহাত্মা গান্ধী নিজের অহিংস, সৎ ও মানসিকতা সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় তৈরী করেছিলেন অনেক প্রথিযশা

---

[৬৩] Robert Payen, The Life and The Death of Mahatma Gandhi, p-565
[৬৪] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৭৪
[৬৪] Robert Payen, The Life and The Death of Mahatma Gandhi, p-566

কর্মী। যাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনপদে প্রবাহিত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার ধারা। এ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফার খান।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রকৃতি ছিল রূঢ়। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু রুক্ষ ঋজু পাহাড়। এ প্রদেশের অধিবাসী পাঠান, ওয়াজির, আফ্রিদিরা ছিল ততোধিক রুদ্র। যদিও ধর্মীয় ভাবে এখানকার শতকরা ৯৫% লোক হচ্ছে মুসলমান কিন্তু হিংসা প্রতিহিংসার প্রচলিত রীতি নিয়ন্ত্রিত করত তাদের জীবন। রক্তের বদলে রক্ত নিতে তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকত। নিজেদের সদাসঙ্গী রাইফেলকে যারা মনে করত পার্থিব জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। [৬৫] সেই চির রুদ্র পাঠানদের অহিংস ও লোকায়ত রাষ্ট্রনীতি এবং অসাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর সবচেয়ে অনুগত শিষ্য আব্দুল গাফার খান (সীমান্ত গান্ধী) এর মাধ্যমে।

আব্দুল গাফার খান মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর অহিংস, সত্যাগ্রহ ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তায় এতই অনুরক্ত ছিলেন যে, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "অন্যান্য প্রদেশের ব্যাপারে যাই হোক না কেন, সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে আমি স্থির নিশ্চিত যে, অহিংস আন্দোলনকে আমরা পেয়েছি ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হিসাবে। অন্য কোন উপায়ে নয় অহিংসার পথেই আসবে পাঠানের মুক্তি"। [৬৬] এ সময় ভারতীয় রাজনীতি দুর্নিবার বেগে ছুটে চলেছে বিপর্যয়ের দিকে। গান্ধীজীর শিষ্য গফর খানই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা জুন বৈঠকের গৃহীত লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন প্লান এর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর পক্ষে ভোট দেন। যে প্লানের ভিত্তিতে ভারত যুগপৎ বিভক্ত ও মুক্ত হয়। এ কথা অনস্বীকার্য, গান্ধীজী নির্দেশিত পথের অভিযাত্রী গাফার খান ব্যাদে ভারতের কোথাও জাতীয় আন্দোলনের কোন নেতা অহিংস সংগ্রামের এ ধরনের নজির রাখতে পারেননি। না সেই সময়ে না পরবর্তী কালে।

গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, অহিংস রাজনৈতিক চেতনার শিক্ষাই গফর খানের মাধ্যমে 'খুদাই খিদমতগার' সদস্যদের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অশান্ত উগ্র জনগোষ্ঠীকে সুস্থ, অসাম্প্রদায়িক, অহিংস রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সনের নির্বাচনে ধর্ম নির্ভর রাজনীতির বীভৎসতা প্রকট হয়ে উঠে। 'সাম্প্রদায়িকতা' ও 'দেশ বিভাগের পান্ডারা' সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের সামনে নির্বাচনের একটা ইস্যু রেখেছিল- হিন্দুস্থান না পাকিস্তান, হিন্দু না মুসলমান, ইসলাম না কাফের, ভোট কে পাবে?" [৬৭] সেই সময়েও খানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস জয়ী হয় ৩০টি আসনে আর মুসলিম লীগ জয়ী হয় ১৭টি আসনে। এ থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে, গান্ধী খানের মাধ্যমে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা সীমান্ত প্রদেশের রুদ্র জনগণের সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাকে কতটুকু অহিংস, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক করেছিল।

---

[৬৫] ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এক সত্যকার সত্যাগ্রহী, সাপ্তাহিক দেশ, পৃ-৩২, ৪৪ সংখ্যা, ৫৭বর্ষ
[৬৬] ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এক সত্যকার সত্যাগ্রহী, সাপ্তাহিক দেশ, পৃ-৩২, ৪৪ সংখ্যা, ৫৭বর্ষ
[৬৭] ডি জি টেন্ডুলকার, আব্দুল গফর খান, পৃ-৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

বৈরী পরিবেশে রূঢ় একটি বিজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের এমন উপমা উপমহাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। গান্ধীজী সর্ম্পকে নেহেরু বলেন, " Gandhi was an odd kind of pacifist, for he was an activist full of dynamr energy. There was no submission in him to safe or any thing that he considered evil; he was full of resistance, though this was peaceful and courteous."[68]

সাম্প্রদায়িক দেশ বিভাগ সাম্প্রদায়িক হিংসা বন্ধ করতে পারেনি; যদিও দেশ বিভাগের পক্ষে প্রধান মূল যুক্তি ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসার অবসান। ফলে গান্ধীজীর চেষ্ঠায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রকোপ থেমে গেলেও ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হবার মত উপমহাদেশের কোন না কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কমবেশী হচিছল। সাম্প্রদায়িক বিভাগ বরং মানুষের মনোজগতে তৈরী করেছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। স্বাধীন দেশে কিছু নেতৃবৃন্দের সক্রিয় সমর্থন ও কর্মকান্ড তখন এ সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষটির নিধনের পরিবর্তে একে হৃষ্টপুষ্ট করতে ব্যস্ত। চিরকাল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার পূজারী গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এ অগ্রযাত্রা দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহু পূর্বে অবসর নিলেও নিজের রাজনৈতিক দর্শন গণমানুষের কাজে পৌঁছে দেয়া ও মানব কল্যাণের কথা চিন্তা করে আশি বছর বয়সেও তিনি সোচ্চার থেকেছেন।

বিগত অনশনে মহাত্মা গান্ধীর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু একটু শক্তি ফিরে পেতেই বিড়লা হাউসে তিনি নিয়মিত প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে থাকলেন। প্রার্থনা সভায় বিভিন্ন ধর্মের হাজার হাজর লোক সমাগম হতো। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে অহিংসা, মানবতা এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার কথা বলতেন। সকলকে এ কর্মে ব্রতী হবার আহবান জানাতেন। অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বাণী পৌঁছে দেয়াই ছিল তার প্রতিদিনকার প্রার্থনার সভার রক্তৃতার আয়োজন। যদিও *দ্বিজাতি* তত্ত্বের বদৌলতে দেশ ভাগ হয়ে মুসলমান সম্প্রদায় পাকিস্তান নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তখনও পূর্বের মতই হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের সাথে ত্রিপিঠক, কোরাণ, বাইবেল, গ্রন্থসাহেব থেকেও তাঁর প্রার্থনা সভায় নিয়মিত পাঠ করা হতো। ভারতবর্ষ বিভক্ত করে 'পাকিস্তান' নিয়ে মুসলমানরা তৈরী করেছিল মুসলিম রাষ্ট্র; যেখানে হিন্দুসহ অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিগৃহীত ও অস্তিত্বহীন। অথচ হিন্দুদের 'হিন্দুস্থান' থেকে মুসলমানদের পাকিস্তানে দেশান্তরের পরিবর্তে মহাত্মা তাদের হিন্দুস্থানে নিরাপদ ও শান্তিতে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করেননি বরং সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকে হিন্দুস্থানে সম্প্রীতিতে বসবাস করার সুবিধার্থে ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিকে রেখেছেন ধর্ম নিরপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় সংঘাত ও অসহিষ্ণুতার কারণে বিভক্ত হওয়া কোন ধর্ম সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রে এমন ঘটনা অস্তিত্বহীন। কেবল মাত্র মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টান্তই মাইল ফলক।

---

[68] Nehru, Discovery India, p-363

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধীজীর এ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি সাম্প্রদায়িক চেতনা অনেকেই তখন গ্রহণ করতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিশোধের নেশায় মত্ত এ গ্রুপটি তখন গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। "তারা কোরাণ ও বাইবেল থেকে বাণী পাঠ করতে দেবেন না; এই মর্মে প্রচার পত্র ও ছাড়া হয়েছিল। হিন্দুদের শত্রু বলে গান্ধীজীকে বর্ণনা করে জনগনকে উত্তেজিত করে তোলা হয়েছিল যে, গান্ধীজী যদি তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন না করেন তবে তাঁকে হত্যার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"[৬৯] মহাত্মা এসকল সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে মাথা নত করলেন না। তিনি তার কর্মে অবিচল রইলেন। ১৯৪৮সাল, ২০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় একটি বোমা হামলা হলো কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কেহই আহত হলো না। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল এটা ভেবে যে, গান্ধীজীর উপর কেউ হামলা করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। এদিকে গান্ধীজী ভীত হলেন না। নিয়মিত প্রার্থনা সভা যথারীতি পূর্বের মতই চলতে লাগল সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শুরু করে এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

"সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর জন্য শুরুতেই তিনি যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন সেটা তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন অবিরাম ভাবে। শেষ দিনেও মহাত্মাজী সভায় এসেছিলেন' ঈশ্বর-আল্লাহ তেরে নাম/সাবকো সুমতি দে ভগবান' গাওয়ার জন্য" [৭০]। ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ, বেলা ৫টা ৪০ মিনিটে গান্ধীজী অপরাহ্নে বিড়লা হাউসের লনে প্রার্থনা সভায় পৌঁছলে এক আগন্তক গান্ধীজীকে তিরস্কার করে বলেছিল, "অপনার আজ দেরী হয়ে গেছে।" গান্ধীজী উত্তর দিয়েছিলেন 'হ্যাঁ'। আর একটা কথা উচ্চারণ করার আগেই তিনটি গুলী ছোঁড়া হলো- অবসান ঘটল তাঁর অমূল্য জীবনের।" [৭১] গুলী গুলো গান্ধীজীর বুকেও তলপেটে লাগল, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আগন্তক আততায়ী নাথুরাম বিনায়ক গডসে; পুনার একজন ব্রাহ্মণ মহাত্মাকে হত্যা করল। যবনিকাপাত ঘটল একটি অমূল্য জীবনের। হোচঁট খেল অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার অগ্রযাত্রা।

মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা অব্যহত রাখার অঙ্গীকারে। পৃথিবীতে অসাম্প্রায়িক রাজনীতির জন্য এমন নিবেদিত প্রাণের দৃষ্টান্ত অদ্বিতীয়। মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বললেন-' ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এমনি এক রক্ত মাংসের মানুষ এ ধরা ধামে পদার্পন করেছিলেন।' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বললেন- 'আমাদের পাপে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবকে জীবন দিতে হইল ইহাই সর্বাপেক্ষা কলঙ্কের কথা।'[৭২] নিজের জীবন উৎসর্গ করে উপমাহদেশের রাজনৈতিক চিন্তায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারকে অব্যাহত রাখলেন মহত্মা গান্ধী। নিজের রক্তে বিভিন্ন মত, চিন্তায় বিশ্বাসী মানুষকে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সূত্রে একত্রিত করে, সকলের কল্যাণে সমস্যা পীড়িত বিশ্বরাজনীতিকে দেখালেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কার্যকর পন্থা।

---

[৬৯] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৭৭
[৭০] ইসমাইল হোসেন, সত্যের সৈনিক, ১১৪তম মহাত্মা গান্ধী জন্ম জয়ন্তী স্মারক পত্র, ১৯৮৩ইং,ঢাকা।
[৭১] মাওলানা আজাদ, (অনুবাদ, আসমা চৌধুরী ও লিয়াকত আলি), ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, পৃ-২৭৯
[৭২] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ-২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পূর্ববর্তী আলোচনা ও বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফলে একটি রাষ্ট্রের সংহতি হয় বিনষ্ট, সৃষ্টি হয় সংঘাত, দাঙ্গা, বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ আর ধূলিসাৎ হয় মানবতা যা সভ্য মানব গোষ্ঠীর জন্য কোন ভাবেই কাম্য নয়। শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে একজন সুস্থ মানুষের পক্ষে তার মত প্রকাশ, ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা ও কৃষ্টি সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে পালন করার স্বাধীনতা একান্ত অপরিহার্য। একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, বর্ণের মানুষ থাকবে। রাষ্ট্রের সাধ্যমত সকল মানুষের মৌলিক অধিকার ও যোগ্যতানুযায়ী মর্যাদা বন্টনই সভ্য সমাজে আধুনিক কল্যাণ মূলক রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু রাষ্ট্র যদি তার কর্মকান্ড সংখ্যাগত কারণে ধর্মীয় অগ্রগণ্যতার ভিত্তি সচল করে তথা রাজনীতিতে যদি সাম্প্রদায়িকতা থাকে, তবে সে রাষ্ট্র সে জাতি কোন দিনই সাফল্য লাভ করতে পারেনা। মানবতাকে বিকশিত করতে পারেনা। সাম্প্রদায়িকতার ফলে রাষ্ট্রীয় বৃহৎ জাতীয়তার মধ্যে তৈরী হয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগত জাতীয়তা আর এ জাতীয়তা গড়ে উঠে প্রধানত ধর্মকে কেন্দ্র করে। গোষ্ঠীগত সমস্যায় ভাষা ও অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য নিয়মক হয়। যাত্রা শুরু হয় সংখ্যাগুরু বনাম সংখ্যালঘুর দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় সন্দেহ , কলহ ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা। এটি যে কোন রাষ্ট্রের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা ও বিকাশ সাধনের পরিপন্থী।

ব্রিটিশরা ভারতকে যখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কৌশলে সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাসে সংক্রমিত করে 'Divide and Rule' নীতিতে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সম্প্রদায়কে নিজেদের রক্তের হোলিখেলায় মত্ত করেছিল; ঠিক সে মুহূর্তে মানবতাবাদী, অহিংস, ধার্মিক কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে তার কর্মযাত্রা শুরু করেন। মহাত্মা গান্ধী বর্ণ সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের কাজ শুরু করেন সেই ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বহু ভাষা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, উপজাতি সমৃদ্ধ তার নিজ মাতৃভূমি ভারতবর্ষেকে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থির করেন।

মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা শুধু সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ মিলে একত্রে সংগ্রাম করার লক্ষ্যেই নয়। অহিংস সম্প্রীতির বন্ধনে একটি হিংসা দ্বেষ মুক্ত সমৃদ্ধ মানব সমাজ গঠনে ছিল সবচেয়ে কার্যকরী একটি কর্মপন্থা। ধর্মের কারণে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিহিংসার জিঘাংসায় মত্ত; তখন তিনি ঘুরেছেন উপমহাদেশের প্রতিটি জনপদে শান্তির বাণী নিয়ে। নিজের চাওয়াকে বলি দিয়েছেন কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার সাথে আপোষ করেননি। দেশ বিভাগ কালীন সময়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যখন মানুষের লাশের সিঁড়ি বেয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার নিশান উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মোহে লিপ্ত। তখন তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে

Dhaka University Institutional Repository

অসাম্প্রদায়িকতার গান গেয়েছেন। নির্যাতিত মানবতার মুক্তির জন্য, মানুষের মনে সম্প্রীতির সদ্ভাব জাগাতে বৃদ্ধ বয়সেও অনশন করেছেন।

সম্প্রতি বাংলা-পাক-ভারতের রাজনীতি শুধু নয় বিশ্ব রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব যেভাবে বেড়েছে তা থেকে বিশ্ব মানবতাকে উত্তরণের জন্য গান্ধীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বিকল্প নেই। গান্ধীর "সেকুলারিজমের" প্রয়োজন আজ বড় বেশী। ধর্মকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে মানব ধর্ম ভিত্তিক কল্যাণমুখী রাজনীতির দর্শনের প্রায়োগিক প্রবক্তার মূল্যায়ণ একমাত্র মহাত্মা গান্ধীরই প্রাপ্য। তিনি সকল ধর্ম মতকে কিভাবে শ্রদ্ধা করতে হয় নিজের ধর্ম মত ঠিক রেখে তার বাস্তবতা লোককে শিক্ষা দিয়েছেন। 'রাজনীতি' যে মানব কল্যাণমুখী ব্রত শুধু ক্ষমতার দাপটে 'মন্ত্রী' বা 'প্রেসিডেন্টগিরি' নয় আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় এ মাত্রাটি গান্ধীজীই সংযোজন করেন।

বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিংসতা, বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন, সন্ত্রাস, স্থিতিহীনতা ইত্যাদির মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নয় এর সাথে গোষ্ঠী ও দলীয় সাম্প্রদায়িকতাই আজ উপমহাদেশকে করে তুলেছে উত্তাল বিভীষিকাময়। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয় গুলো উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি অহিংসা ও অসম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বপক্ষে কাজ করে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। জীবন দিয়ে তিনি প্রচার করেছেন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাণী। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

আজকের বিশ্বে গণতান্ত্রিক কল্যাণ মূলক রাজনীতিকে জাতীয় জীবনের উন্নতির চরম সোপান বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবার একই সাথে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞায় যে কোন মূল্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল বা অর্জন করাকে বলা হয় দলের মূল উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতা হস্তগত করার মধ্যেই দলের সাফল্য নির্ভরশীল। এমন বৈপরীত্য চিন্তা রাষ্ট্রে শুধু আনতে পারে সন্ত্রাস, হিংসা, জিঘাংসা, স্থবিরতা এবং পশ্চাৎপদতা; অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নয়। সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী রাজনীতির পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক বিশ্বাস, চর্চা ও সামগ্রীক রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পূর্ণ বিকাশ। একমাত্র অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিই পারে একটি রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে। শুধু উপমহাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রও জাতির মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীক রাজনীতির যে রক্তক্ষয়ের মাত্রা ও শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, তা বিশ্ব মানবতা ধ্বংসের সহায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কোন ভিন্ন মতের মূল্যায়ণ তো দূরের কথা অস্তিত্বকে স্বীকার করেনা। নিজের স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীকে নিধন করার কাজে লিপ্ত থাকে। যে কারণে রাষ্ট্রীয় পরিবেশ মানব কল্যাণমুখী, অহিংস না থেকে শুরু হয় শোধ প্রতিশোধের জিঘাংসার শাসন। 'একজনকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বঞ্চনাকারী কোন দিন সুখী হতে পারে না এবং হিংসা কোন দিন শান্তি আনতে পারে না'- এ দেদীপ্যমান সত্যটি ছিল গান্ধীজীর।

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধী বহু ভাষা ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি উপজাতি সমৃদ্ধ নিজস্ব মাতৃভূমি এ ভারত উপমহাদেশে তার কর্মকান্ডের সূচনা করেছিলেন সকলকে একসাথে নিয়ে। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে পৃথক করে দেখেননি, যেটা দেখেছিলেন জিন্নাহ্ দ্বি-জাতিতত্ত্বে। জিন্নাহ্র কাছে ধর্ম ছিল শুধু 'ইসলাম'। যদিও স্বধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে তাঁর যেটুকু মতি ছিল তা উল্লেখ করার মত নয়। অন্য পক্ষে স্বধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে গান্ধীজীর মতি উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁর ধর্ম ছিল মানবতা শুধু 'হিন্দু' নয়। তিনি সমসাময়িক সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মানবতার কথা, অসাম্প্রদায়িকতার তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন কিন্তু তারা মানেনি। ফলে দেশ বিভক্ত হয়েছে। বিভক্ত হয়েছে জাতীয়তা, মানবতা, ভূমি, চিন্তা, পরিবার, প্রতিবেশী, সম্পর্ক সবকিছু। ইতিহাসে তৈরী হয়েছে 'নোয়াখালী ধ্বংসলীলা', 'গ্রেট ক্যালকাটা কি লিং', 'পাঞ্জাব ও পাকিস্তানের রক্ত নদী' এবং 'পৃথিবীর বৃহত্তম বাস্তু ত্যাগ'।

মহাত্মা গান্ধীজী বিমর্ষ হয়েছেন কিন্তু নিজের চিন্তায় সাম্প্রদায়িকতা আনেননি। তিনি কথা বলেছেন অসাম্প্রদায়িকতার; বলেছেন অবিভক্ত ভারতের হিন্দু, শিখ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সহ সকল ধর্মাবলম্বী ভারতবাসীর সম্প্রীতির কথা। হিংসার মাধ্যমে তিনি স্বরাজ চাননি। "হিংসার মাধ্যমে যে স্বরাজ আসে তা বিপজ্জনক"- এটা ছিল তাঁর মূল্যায়ণ। হিংসার জন্য সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এসেও অনেক সময় আন্দোলন স্থগিত করে সমালোচিত হয়েছেন কিন্তু ক্ষমতার মোহে রক্তের দাগে নিজেকে এবং রাজনীতিকে রঞ্জিত করেননি; মানবতাকে কলংকিত করেননি। সাম্প্রদায়িকতার জিঘাংসায় তিনি নিজের প্রাণ দিয়েছেন তবু অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার শিক্ষা প্রজ্জলিত রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলার ভূতপূর্ব গর্ভনর মিঃ ক্যাসি মন্তব্য করেছিলেন- "He was a monk among the politicians and a politician among the monks.[১]" সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের বিশৃংখল ও সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মানুষের কল্যাণ শান্তির জন্য আজ প্রয়োজন সকল মানুষকে মানবধর্মে বিশ্বাসী করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরী করা। আর এ কাজটি শুধু গতানুগতিক রাজনীতির পরিবর্তে গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি চিন্তাই রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা, হানাহানী, গৃহযুদ্ধ, হিংসাকে সরিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের আলোকে সকলকে আলোকিত করতে পারে। শুধু উপমহাদেশ নয় সমস্ত বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের জন্য, মানবতার মুক্তির জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. মারটিন লুথার কিং (জুনিয়র) যথার্থই বলেছেন- "Gandhi was inevitable- He lived, thought and acted, inspired, by the vision of humanity evolving toward a world of peace and harmony. We may ignore him at our risk."[২] পৃথিবীতে গান্ধীজীই সম্ভবত এক মাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি আজীবন মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনে সম্পৃক্ত হবার অসাম্প্রদায়িক চেতনার

---

[১] তোফায়েল, *বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী*, পৃ-৩০১

[২] সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ*, পৃ-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলেছেন। সকল ধর্মকে বলেছেন নিজের ধর্ম। সকল মানুষকে বলেছেন নিজের মানুষ। একারণেই রাজ ঘাটে গান্ধীজীর দাহস্থলে পাথরে খোদাই করা লেখা আছে গান্ধীজীর নিজের কথা-

I am a Hindu
I am a Muslim
I am a Christian
I am a Buddhist
I am a Jain
I am a Sikh
I am a Parsi[৩]

401320

গান্ধীজী সম্পর্কে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) যথার্থই বলেছেন-"As leader of his people unsupported by any outward authority a political whose success rests not upon craft or mastery of technical devices, but simple on the convincing power of his personality; a victorious fighter who has devoted all his strength to the uplifting of his people..... a man who has confronted the brutality of Europe with the dignity of the smile human being, and thus at all times risen superior. Generations to come it may be will scarcely believe that such a one this ever in flesh and blood walked upon this earth[৪]

১৯৪৮খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী সাম্প্রদায়িক আততায়ীর গুলীতে মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার পর সারা বিশ্বের বিবেক স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে লুইস ফিশার (Louis Fischer) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন," Mahatma Gandhi was what he had always been: a private citizen without wealth, porperty, official title, official post, academic distinction, scientific achievement, or artistic gift. Yet men with governments and armies behind them paid homage to the little brown man of seventy-eight in a lioncloth. The Indian authorities received 3,441 messages of sympathy, all unsolicited, from foreign countries."[৫]

শোক বিহবল জওহরলাল নেহেরু দিল্লী বেতারে অলিখিত ভাষণে বলেছিলেন-"The light has gone out of our lives and there is a darkness every where and I do not quite know what to tell you and how to say it Our beloved leader, Bapu as we call him, the father of our nation, is no more Perhaps I am wrong to say

---

[৩] তোফায়েল, বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, পৃ- ৩৯৩
Nanda, B.R Ed., *Gandhi 125 Years*, p.xvi
[৫] Louis Fischer, The life of Mahatma Gandhi, p- ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him these many years.....The light has gone out, I said and yet I was wrong. For the light that shone in this country was no ordinary light. The light that has illumined this country for these many years will illumine this country for many more years and a thousand years later that light will still be seen in this country, and the world will see it."[৬]

সেদিন সত্যিই তাদের জীবন থেকে আলো নিভে গিয়েছিল। কিন্তু এ আলো আজো দেদীপ্যমান। সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গান্ধীজীর জীবন দর্শন, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, সত্যাগ্রহ, সত্যবাদিতা, অহিংস নীতি ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রয়োজন আজ বড় বেশী। বাস্তবতার আলোকে আজ সকলেই অবশ্য স্বীকার করেন যে, গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার বাস্তবায়ন ছাড়া বিশ্বশান্তি সম্ভব নয়। হিংসা ও মানুষ নিধনের যুদ্ধের রাজনীতিকে পরাস্ত করে, বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষকে মানবতার বন্ধনে একাত্ম করার সাফল্য অর্জন একমাত্র গান্ধীজীর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমেই সম্ভব। মহাত্মার শোক বানীতে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট সেক্রেটারী জর্জ সি, মার্শাল(Georgc. C. Marshall) যেমন বলেছেন, "Mahatma Gandhi was the spokesman for the conscience of all mankind." এ উক্তির সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, মহাত্মা গান্ধী যথার্থই মানব জাতির বিবেকের সত্যিকার প্রতিনিধি ছিলেন।

---

৬ Louis Fischer, The life of Mahatma Gandhi, p-9

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিক্রমা

১৮৬৯ সালঃ - ২রা অক্টোবর পোরবন্দর রাজ্যে গান্ধী পরিবারে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী জন্ম গ্রহন করেন।

- মাহাত্মা গান্ধীর পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী ও মাতার নাম পুতুলী বাঈ।

১৮৭৬ সালঃ - গান্ধীজী রাজকোটের তালুক বিদ্যালয়ে ও পরে কাথিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।

- বিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে ব্যবসায়ী গোকুল দাস মাকানজীর কন্যা কস্তুরীবাঈ এর সাথে বিবাহরে জন্য বাগদত্তা হন।

১৮৮৩ সালঃ -হাই স্কুলে পড়াকালীন সময়ে কস্তুরীবাঈ এর সাথে ১৩ বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৮৮৫ সালঃ - মহাত্মার পিতৃবিয়োগ ঘটে।

১৮৮৭ সালঃ - রাজকোট হাইস্কুল হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভবনগর সমলদাস কলেজে পড়েন।

১৮৮৮সালঃ - ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলাত গমন করেন ও ১৮৮৮-৯০সাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

- পবিত্র গীতা গ্রন্থ দ্বারা প্রভাবিত হন।

১৮৯১ সালঃ - ব্যারিস্টারী পাশ করে স্বদেশ প্রত্যবর্তন করেন।

-স্বদেশে ফেরার সাথে সাথেই মায়ের মৃত্যু সংবাদ পান

- নিজ জাত ভাইদের একদল গান্ধীজীকে জাতিচুত্য করেন।

১৮৯২ সালঃ - বোম্বাইতে আইন ব্যবসা শুরু করেন কিন্তু নিরতিশয় লাজুক ও নৈতিক মনোভাবের জন্য আইন ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে পারেনি।

১৮৯৩ সালঃ - পোরবন্দরের মুসলীম শেঠ আব্দুল করীম যাভেরীর অংশীদারী কারবার "আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোম্পানীর" দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কোম্পানীতে, কোম্পানীর পক্ষে বড় উকিল ব্যারিস্টারদের মামলা বুঝানোর চাকুরী নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন।

- নাটালের সুপ্রীম কোর্ট সর্বপ্রথম ভারতীয় আইনজীবি হিসেবে তালিকাভূক্ত হন।

- এখানে অবসর সময়ে পবিত্র বাইবেল ও পবিত্র কোরান সহ ধর্মীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং লিওতলস্তয়ের "ঈশ্বরের রাজ্য তোমার অন্তরে রহিয়াছে" (The Kingdoom of God is Within You) পুস্তকটি পাঠ করে প্রভাবিত হন।

১৮৯৪ সালঃ - নাটালে প্রথম ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপন করেন।

১৮৯৬ সালঃ - দেশে প্রত্যবর্তন করেন ও পরে স্ত্রী এবং সন্তান সহ দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন।

- দেশ ফিরে আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের অভাব অসুবিধা দূর করার জন্য তাদের পক্ষে আন্দোলনের সূচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৭ সালঃ জানুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার দারবানে অবতরণ করা মাত্র স্থানীয় ভারতীয় প্রবাসীগণ নিজেদের নেতা রূপে গান্ধীজীকে বিরাট অভ্যর্থনা জানান।

১৮৯৯ সালঃ -বোয়ার যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের দ্বারা একটি এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করে 'বুর' যুদ্ধ পদক পান।

১৯০১ সালঃ - ১৯০১ সালে দেশে ফিরেন কিন্তু ট্রান্সভালে এশিয়দের বিপক্ষে আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে ১৯০২ সালে পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা যান।

- এ বছরই ট্রান্সভালের সুপ্রীম কোর্টের এটর্নী হিসাবে তালিকাভূক্ত হন।

১৯০৪ সাল - রাসকিন রচিত "Unto the Last" বইটি পড়ে অভিভূত হন। এটি পরবর্তীতে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করে।

- ডারবানের নিকট ফিনিক্স উপনিবেশ স্থাপন করেন।

- দক্ষিণ আফ্রিকায় "Indian Opinion" পত্রিকা চালু করেন।

- জোহিন্সবার্গ এ প্লেগ রোগের মাহমারী দেখা দিলে হাসপাতাল সংগঠন করেন।

১৯০৬ সালঃ - যুলু বিদ্রোহ কালে আহতদের খাটুলী বাহক রূপে ভারতীয় কোর গঠন করেন।

- আমরণ ব্রহ্মচার্য অবলম্বনের প্রতিজ্ঞা করেন।

- ট্রান্সভাল এশিয়াটিক আইন সংশোধন অর্ডিন্যান্স এর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় নীতি অবলম্বনের শপথ গ্রহন করেন।

- ভারতীয়দের বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ সেক্রেটারীর নিকট বিলেত গমন করেন।

১৯০৭সালঃ - নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ(Passive Resistance) আন্দোলন সংগঠন করেন।

- জনগনের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন।

১৯০৮ সালঃ - ট্রান্সভাল ত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় দুই মাসের কারাদন্ড প্রাপ্ত হন; কিন্তু জেনারেল স্মার্টস তাঁকে আপোস শর্তে মুক্তি দেন।

- আপোস নাকচ হলে গান্ধী পুনায়ায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেন এবং দুই মাস সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯০৯ সালঃ - ডেপুটেশনে ইংল্যান্ড গমন করেন।

- জাহাজে দেশে ফেরার পথে তাঁর জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কীত প্রথম বই "হিন্দ স্বরাজ" গুজরাটি ভাষায় লেখেন।

১৯১২ সালঃ - গান্ধীর রাজনৈতিক গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে "হিন্দ স্বরাজ" গ্রন্থের সমালোচনা করেন।

- হেরমান কালেনবাক নামক একজন জার্মান স্থপতি ট্রান্সভালে জোহানিসবার্গের নিকট ১১০০ একর জমি গান্ধীকে দান করেন; সেখান গান্ধী তলস্তয় ফার্ম স্থাপন করেন। এখানে সত্যাগ্রহী কর্মীদের ও পরিবারবর্গের কর্ম সংস্থান করেন।

-ফার্মে সকলেই কায়িক পরিশ্রম করত এখানে গান্ধী নিজেও জুতাসেলাই ও সুতারের কাজ শেখেন ও নৈতিক ধর্ম বিষয়ে বই লেখেন।

- ফার্মে দু'জন বাসিন্দার নৈতিক পতনের জন্য তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্থ করে এক সপ্তাহ

Dhaka University Institutional Repository

উপবাস পালন করেন ও ৪ মাস যাবৎ শুধু একবার আহার করেন।

- দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মাথা পিছু ৩ পাউন্ড বিশেষ কর ধার্য্য রহিত করার অঙ্গীকার ভঙ্গ করায় ইউনিয়ন সরকাররে বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুরু করেন।

- গান্ধীজী গ্রেফতার হন এবং কারাদন্ড প্রাপ্ত হন পরে জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

১৯১৪ সালঃ - প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে লন্ডন থাকাকালীন সময়ে "ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স কোর" গঠন করেন।

১৯১৫ সালঃ - ভারতে ফিরেন এবং যুদ্ধের ব্যপারে বৃটিশ সরকারকে সহায়তা দান করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

-স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত 'মহাত্মা' উপাধি প্রাপ্ত হন।

- ভারতের কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান করেন।

- মে মাসে সবরমতি নদীর তীর কোচরাবে সত্যাগ্রআশ্রম স্থাপন।

১৯১৬ সালঃ -রেলের তৃতীয় শ্রেনীতে চড়ে সমগ্রভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ভ্রমণও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের লখ্নৌ চুক্তিতে সম্মতি দান।

১৯১৭ সালঃ -ভারত হতে বিদেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরনের বিরুদ্ধে আন্দোলন।

- বিহরের চনপারনে এপ্রিল মাসে নীল চাষে নিযুক্ত কর্মীদের অবস্থা অনুসন্ধান ও তাদের পক্ষে কথা বলার জন্য গ্রেফতার হন ও পরে মুক্তি লাভ।

১৯২৮ সালঃ -বস্ত্র শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে আহমদাবাদে আন্দোলন শুরু করেন এবং আপোস মিটমাটের জন্য উপবাস করেন।

- বোম্বাইয়ের কয়রা জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারণে শস্যহানীর জন্য কৃষকদের খাজনা মওকুফের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন।

১৯১৯ সালঃ -রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্র শুরু করেন এবং ৬ এপ্রিল সাড়া ভারতে 'হরতাল' আহবান করেন এবং পাঞ্জাব প্রবেশেরে সময় গ্রেফতর হন।

- ১৩ এপ্রিল সংঘঠিত জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যার সংবাদ পেয়ে ৩ দিনের উপবাস ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন।

- এই আন্দোলন ভয়াবহ সহিংস রূপ নিলে খাদি আন্দোলন করেন।

- সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক 'নবজীবন' ও সাপ্তাহিক 'ইয়ং ইন্ডিয়া' সম্পাদন শুরু করেন।

- খেলাফত কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২০ সালঃ - খিলাফত রক্ষার জন্য ভাইস রয়ের নিকট ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

-'কাইজার-ই-হিন্দ', 'যুলু যুদ্ধ' পদক ও 'বুর যুদ্ধ পদক' প্রত্যাখান করেন।

- খিলাফত আন্দোলনে সমর্থন করেন ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

১৯২১ সালঃ - অসহযোগ আন্দোলনকে খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে প্রবল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন ও যুগপৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

১৯২২সালঃ - প্রবল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়ে চৌরাচৌরিতে জনতা ২১ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারলে গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

- চৌরা চৌরির ঘটনার জন্য তিনি অনুসূচনা হিসাবে ৫ দিনের উপবাস করেন।
- ১০ই মার্চ মহাত্মা গ্রেফতার হন এবং ১৮ই মার্চ ৬ বছরের জন্য কারা দন্ড প্রাপ্ত হন।

১৯২৩ সালঃ - কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৯২৪ সালঃ - ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী মুক্তিপান এবং ১৮সেপ্টেম্বর হিন্দু মুসলিম একতার জন্য ২১দিনের উপবাস করেন।

- বেলগাও কংগ্রেসের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯২৫ সালঃ - নিখিল ভারত সূতাকাটা সমিতি স্থাপন করেন।

- নিজের আশ্রমবাসী একজনের অপকর্মের জন্য অনুশোচনা সূচক ৭দিন উপবাস করেন।

- এসময় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The story of my Experiments with Truth' রচনা করেন।

১৯২৮ সালঃ - ভারতের স্বাধীনতার জন্য কৃত সংকল্পের প্রস্তাব উত্থাপন করেন কোলকাতা কংগ্রেসে।

১৯২৯ সালঃ -৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে 'স্বরাজ' এর ঘোষণা করেন।

১৯৩০ সালঃ - নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলনের একক নায়ক নিযুক্ত হন।

- মার্চ মাসে 'সল্টমার্চ' আন্দোলন শুরু হয় এতে করে প্রবল বেগে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন এ সময়কার ঘটনা।

- ৫ মে তিনি গ্রেফতার হন এবং কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়।

১৯৩১ সালঃ - জানুয়ারী মাসে বিনা শর্তে মুক্তিপান।

- মার্চ মাসে 'গান্ধী অরউইন' চুক্তি হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়।

- দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের জন্য বিলেত যাত্রা করেন।

- গোলটেবিল বৈঠক শেষে দেশে ফিরলে বোম্বে(মুম্বাই) বন্দরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৩২ সালঃ - সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ভিত্তিতে সম্প্রদায় ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তিনি জেলেই এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করে।

- ভারত সরকার গান্ধীজীর দাবী মেনে নেন ও বিভিন্ন সম্□প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে ১৭ই আগস্টের 'পুনা চুক্তি' এর মাধ্যমে অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩ সালঃ -কারাবাস কালেই তিনি ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রকাশিত 'হরিজন' পত্রিকা স্থাপন করেন।

-৮ই মে কারাগারে আত্মশুদ্ধির জন্য ২১ দিনে র উপবাস শুরু করেন।

-৮ তারিখেই রাত্র ৯টার সময় তিনি মুক্তিপান।

- ২৯শে মে উপবাস ভঙ্গ করেন।

- ২৬শে জুলাই সত্যাগ্রহ আশ্রম তুলে দেন।

- ৩০শে জুলাই আহমদাবাদ হইতে রাস পর্যন্ত ৩৩জন অনুসারীকে নিয়ে আইন আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৩১শে জুলাই গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয়।

- ৮ই আগস্ট তিনি মুক্তি পান।

- সরকারী একটি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য তিনি গ্রেফতার হন।

-অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে না দেওয়ায় ১৬ই আগস্ট জেলেই উপবাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

- ২৩শে আগস্ট তাঁকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়া হয়।

- ৭ই নভেম্বর 'হরিজন' উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করেন।

১৯৩৪ সালঃ - ১৭ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন যে ১লা অক্টোবর রাজনীতি থেকে অবসর নেবেন।

- ২৬শে অক্টোবর পল্লী শিল্প সমিতি গঠন করে হরিজন সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন।

১৯৩৬ সালঃ -৩০শে এপ্রিল মধ্যপ্রদেশেরে ওয়ার্দার নিকট সেবা গ্রামে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৯৩৭ সালঃ -ওয়ার্ধায় শিক্ষা সম্মেলন করেন এবং কারুশিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেন।

১৯৩৯ সালঃ - ৩রা মার্চ রাজকোট এ আমরণ অনশন করেন; কারণ সরকার অঙ্গীকারকৃত শাসন সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে নাই।

- ৭ই মার্চ ভাইসরয়ের হস্তক্ষেপে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৪০ সালঃ - ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন রীতি মঞ্জুর করেন।

- সত্যাগ্রহ সংক্রান্ত প্রাক সেন্সরের কারণে গান্ধীজীর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪১ সালঃ -৩০শে ডিসেম্বর নিজের অনুরোধে কংগ্রেসের নেতৃত্ব হতে অব্যহতি নেন।

১৯৪২ সালঃ -১৪ই জানুয়ারী তাঁর বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল পত্রিকা প্রকাশ পায়।

- ২৭শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সাথে দেখা করে এ মিশনের প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন।

- ৮ই আগস্ট বোম্বেতে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের পক্ষে অহিংস পথে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

- ৯ই আগস্ট পুনার আগা খান প্রাসাদে গান্ধীজীকে বন্ধী করা হয়।

-১৫ ই আগস্ট গান্ধীজীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই আগাখান প্রাসাদে হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৩ সালঃ - ১০ই ফেব্রুয়ারী রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বন্ধী অবস্থায় ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন।

- ৩রা মার্চ গান্ধীজী উপবাস ভঙ্গ করেন।

১৯৪৪ সালঃ -২২শে ফেব্রুয়ারী আগাখান প্রাসাদে বন্ধী অবস্থায় গান্ধীজীর পত্নী কস্তুরী বাঈ মৃত্যুবরণ করেন।

- ৬ই মে বিনাশর্তে আগাখান প্রাসাদ থেকে মুক্তিপান।

- সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখে নিজের উদ্যোগে পাকিস্তান দাবী সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে বৈঠক করেন।

১৯৪৫ সালঃ -জানুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে বঙ্গদেশ, আসাম, দক্ষিন ভারত ভ্রমণ করে অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হিন্দুস্থানী প্রচার চালান।

-১০ই ফেব্রুয়ারী পূর্বে বন্ধ হওয়া পত্রিকা গুলো চালু করেন।

- ১৭ই এপ্রিল সানফ্রানসিসকো সম্মেলনে বার্তা পাঠান যে, বিশ্ব শান্তি ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত সম্ভব নহে।

- এপ্রিল ও মে মাসে ব্রটিশ মন্ত্রী মিশনের সাথে সিমলায় রাজনৈতিক আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

- জুলাই মাসে দলীয় নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে ভাইসরয় কর্তৃক পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯৪৬ সালঃ - মন্ত্রী মিশনের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয়।

- মুসলীম লীগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের' কারণে কোলকাতায় প্রবল দাঙ্গা হয় ও তার প্রতিক্রিয়া পূর্ববঙ্গের নোয়খালী ছাড়াও ভারতে বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়,এতে গান্ধী বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের জন্য তিনি বাংলাদেশে আসেন; ৮ই নভেম্বরে নোয়াখালীতে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করে শান্তির জন্য বিভিন্ন জনপদে ঘুরে কাজ করেন ও ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ পর্যন্ত অবস্থান করেন।

১৯৪৭ সালঃ - নোয়খালীর দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তিনি ২রা মার্চ তারিখে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

- ৩রা জুনের লর্ড মাউন্টব্যাটন প্লান এর পক্ষে ১৪ই জুনের কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তার হস্তক্ষেপে দেশ ভাগের পক্ষে সম্মতির সিদ্ধান্ত হয়।

- ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার প্রাক্কালে কোলকাতার দাঙ্গা রোধের জন্য তিনি কোলকাতায় অবস্থান করেন।

- ১লা সেপ্টেম্বর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধের জন্য তিনি আমরন অনশন করেন।

- ৬ই সেপ্টেম্বর শান্তি ফিরে এলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

- পাকিস্তানের পাওনা বুঝিয়ে দেয়া ও পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের বৈরী মনোভাব বিদূরনের জন্য অনশন করেন; এরফলে ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রাপ্য অর্থের কতকাংশ মিটিয়ে দেয়।

১৯৪৮ সালঃ -পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ব্যপক সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষিতে গান্ধীজী শান্তির দূত হিসেবে মুসলীম লীগের দুই নেতা সোহরাওয়ার্দী ও খালেকুজজ্জা খাঁ কে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে পাঠান।

- পাকিস্তানের দাঙ্গার প্রেক্ষিতে দিল্লীতে ও ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে তিনি ১৩ই জানুয়ারী থেকে বিড়লা হাউসে আমরণ অনশন শুরু করেন।

- ১৮ ই জানয়ারী গান্ধীজী প্রদত্ত শর্তে সকল নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার করলে এবং দাঙ্গা থেমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

- ২০শে জানুয়ারী গান্ধীজীকে হত্যার প্রচেষ্ঠায় তাঁর প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরিত হয়।

- ৩০শে জানুয়ারী বিড়লা নিবাসে শান্তির বাণী প্রচারের জন্যে উপস্থিত হইবার প্রাক্কালে নাথুরাম গডসে কর্তৃক পিস্তল হতে নিক্ষিপ্ত ৩বার গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধী ইহলোক ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

[মহাত্মা গান্ধীর বংশানুক্রমিক তালিকা]

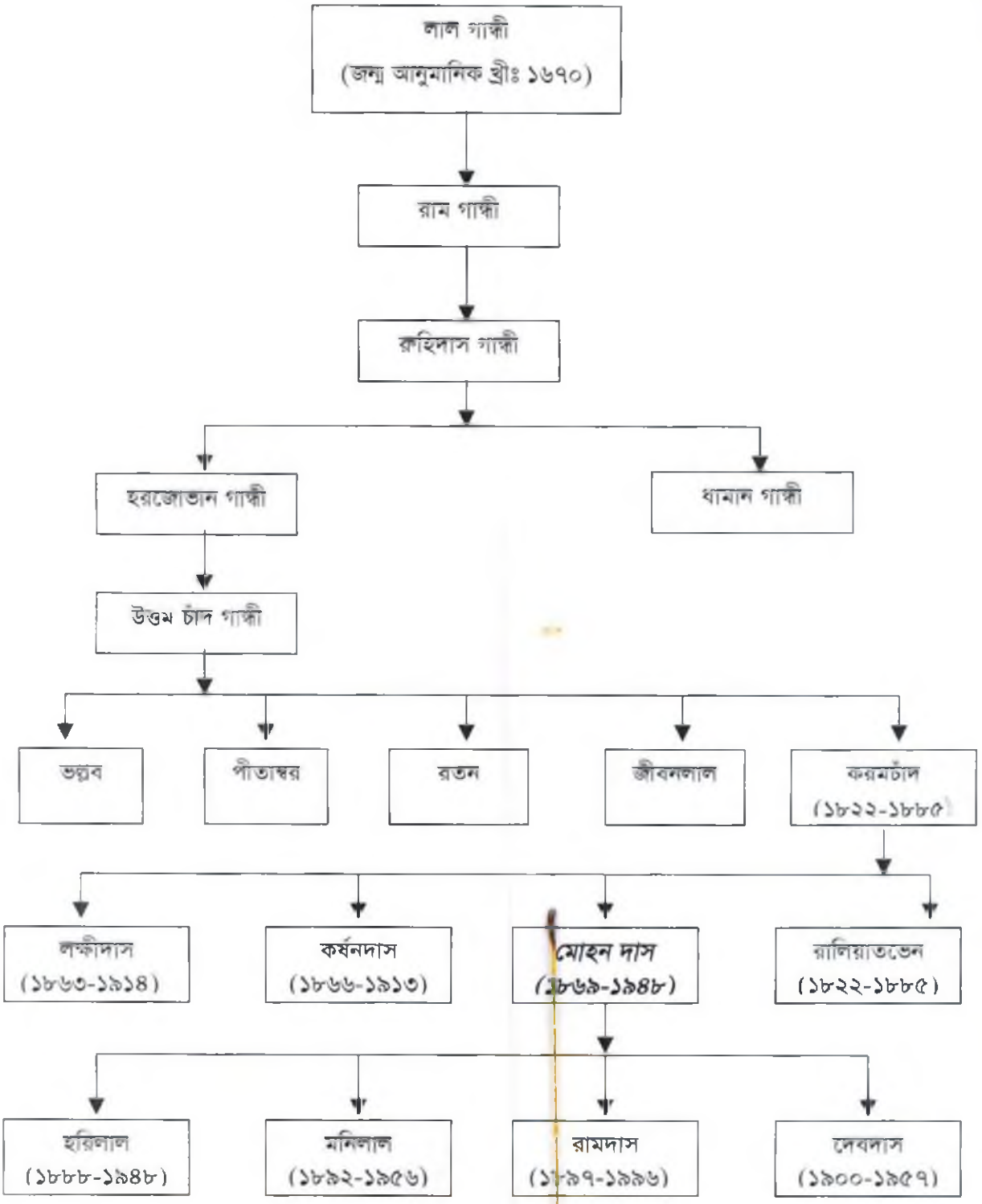

Dhaka University Institutional Repository

দৈনন্দিন জীবন যাত্রা

Ξ গান্ধীজী প্রত্যহ ভোর ৪ টায় ঘুম থেকে উঠতেন এবং শয্যাতে থাকা অবস্থাতেই এক গ্লাস মধুর সরবত খেতেন।

Ξ দৈনন্দিন কার্যক্রমের প্রথমে শুরু হতো প্রার্থনা দিয়ে। প্রার্থনায় পবিত্র গীতা পাঠ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করা হতো। প্রার্থনায় যখন রামধুন সুর করে কোরাস গাওয়া হতো তখন তিনি তালি দিয়ে সঙ্গীতের তাল রক্ষা করতেন এবং নিজেও গাইতেন।

Ξ সকাল ৫.৩০ মিনিটে গান্ধীজী প্রায় ১৬ আউন্স পরিমান কমলা অথবা মোসাম্বির ফলের রস পান করতেন।

Ξ প্রার্থনা চলত সকাল ৭ টা পর্যন্ত। প্রার্থনা শেষে সকাল ৭টায় তিনি ১৬ আউন্স ছাগদুগ্ধ, ৮ আউন্স সিদ্ধ করা সব্জি ও ২ আউন্স পরিমান সালাদ খেতেন।

Ξ খাওয়া শেষে গান্ধীজী প্রাতঃভ্রমণে বেরুতেন। প্রতি দিন তিনি প্রায় এক থেকে দেড় মাইল হাটতেন। এ সময় সঙ্গী ও দর্শন প্রার্থীগণের সাথে আলাপ করতেন এবং আশ্রমে ফিরতেন সকাল ৯ টায়।

Ξ ৯টার মধ্যে আশ্রমে ফিরেই তিনি স্নান করতে প্রস্তুত হতেন। প্রতিদিন রোদের মধ্যে ম্যাসেজ টেবিল পেতে রাই সরিষার তেলের মধ্যে লেবুর রস মিশিয়ে তাঁকে ১ ঘন্টা নাগাদ পুরো শরীর মালিশ করতে হতো।

Ξ এ সময় তিনি খবরের কাগজ পড়ে ঘুমিয়ে যেতেন। ঘুম থেকে উঠলে গরম পানিতে শরীর ভিজিয়ে তোয়ালে দ্বারা শরীরের তেল তুলে ফেলা হতো। গান্ধীজী পারতপক্ষে সাবান ব্যবহার করতেন না।

Ξ একদিন অন্তর একদিন গান্ধীজী দাঁড়ি কামাতেন। এ কাজটি তাঁর সেবক সেবিকারাই করে দিত।

Ξ অপরাহ্ণে ২টার সময় গান্ধীজী খেতেন এক গ্লাস ডাবের জল অথবা নারকেলের দুধ।

Ξ বৈকালিক প্রার্থনায় যোগ দেয়ার আগে গান্ধীজী ১৬ আউন্স ছাগদুগ্ধ ও ১০ আউন্স খোরমা খেজুর একত্রে সিদ্ধ করে খেয়ে নিতেন এবং শেষে কিছু ফল মূল খেতেন। মহাত্মা গান্ধীজীর খাবার মেনু কয়েক দিন পরপরই পরিবর্তন হতো তবে আমূল কোন পরিবর্তন নয়।

Ξ রাতে গান্ধীজী বড় একটা কিছু খেতেনে না। প্রতিদিন তাঁর পায়ের পাতায়, হাতের তালুতে এবং পায়ের আঙুলের ফাঁকে মাখন মাখিয়ে দেয়া হতো।

Ξ প্রতিদিন তিনি রাত্রি ৮.৩০টার মধ্যে শুয়ে পড়তেন। কোন কোন দিন রাত্রি ২টা থেকে আড়াইটার মধ্যে জেগে উঠে গুরুত্বপূর্ন রাজনৈতিক চিঠি পত্রের জবাব লিখতেন বা হরিজন পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখতেন।

Ξ মহাত্মা গান্ধী সেলাই বিহীন একটুকরা কাপড় পড়তেন এবং গায়ে চাদর হিসেবে একখন্ড কাপড় ব্যবহার করতেন।

Ξ গান্ধীজী ব্রহ্মচর্য পালন করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

SPEECH AT PRAYER MEETING

NEW DELHI,
April 4, 1947

BROTHERS AND SISTERS,

Will there be peace today or are you going to repeat what you did yesterday and the day before?

Voices came from all sides: "It is all quiet today. There will be no trouble today. Please hold the prayer."

Gandhiji asked again:

Are you sure you did not drown a voice or two in your own? Is there anyone who wants to oppose?

A hand went up. Gandhiji said:

Very well. In that case, there will be no prayer today also. I shall not hold the prayer so long as there is even one person who refuses to understand or does not voluntarily leave the meeting. It serves no purpose if the police seizes him and takes him away. People should not gang up like this to suppress a smaller group. Even if there are only a few who oppose, they should be persuaded. They should leave the place if they disapprove of anything that happens here. They should not create disturbance. If this one person is convinced of my point and goes away from here I shall hold the prayer. Otherwise he must sit through the prayer in silence.[1]

Are you all quiet now? Has the gentleman who did not want the prayer to be held, left? I shall appeal to all of you that he should not be threatened or bullied. What will happen to the poor man if the police take him away? Whatever may be his opinion about himself, I shall only pity him. Who will protect him if I do not? If a person calls himself a Hindu or a Muslim and wants to stop me from holding the prayer, why should he be attacked?

He says that I should not hold the prayer in this temple. But this temple belongs to the scavengers who come to me and complain against outsiders creating trouble in their temple. How can I console my little brothers? I am their elder brother. I am an excellent Bhangi. I do the external cleaning and clean the latrines, but our hearts too need to be cleansed. A true Bhangi has to do the inner cleaning too, which I am doing. If we do not cleanse our hearts, if we do not get rid of the feeling of high and low, Hinduism is not going to survive. It has survived so far because it is a great religion. It is still alive even though it is gasping for breath. But if we do not give up the feeling of high and low it would go on weakening even though it is a great religion. Even Dr. Moonje[1] has supported me in this. He has written me a letter saying that even though he does not agree with me on other points — he believes in the training of the sword —he is in complete agreement with me in the matter of removal of untouchability and the feeling of high and low.

Hence, those who oppose my prayer are destroying Hindu dharma. They should understand that I am as much a Parsi, a Christian and also a Muslim as I am a Hindu. What wonderful meaning is conveyed by *Auz-o-Billahi*. I have not read the *Yajurveda*. But a gentleman writes to say that everything it contains is to be found in the *Yajurveda*. In that case why should you oppose it? Religious sentiment whether expressed in Arabic, Sanskrit or Chinese, is always noble. That is why I would like to ask that gentleman if he has understood my point.

Dhaka University Institutional Repository

If he is not a Hindu and belongs to some other religion, let him not attend the prayer. In any case only a few Muslims join my prayer. The Muslims too have been asking me what right I have to recite portions from the Koran. Yet they did not prevent me from doing so in Noakhali. Could they not have stopped me?

But no one who belongs to Hinduism can have reason to complain. We have 108 upanishads. One of them is the *Allopanishad*. The wonderful thing about Hinduism is that it assimilates people from outside. But its one great limitation is untouchability or the feeling of high and low. This poison has spread in it. It can survive only if the poison is removed. These people ntalk of saving Hinduism with the help of the sword. They carry swords while doing their drills. Why? For killing [their oppoents]? This is not the way to advance Hinduism.

A religion grows through truth alone. I have learnt this from Hindu dharma. It has also taught me that "there is no religion greater than Truth"[2] and that "ahimsa is the greatest religion"[1]. Patanjali[2] put the five vows of non-violence, truth, non-possession, non-stealing and brahmacharya on a scientific plane. These are to be found in the other religions too. But Hinduism alone has provided a scientific basis for them.

After this Gandhiji while narrating the story of the South Indian Harijan saints Nandanar and Avvaiamma, said that Avvaiamma's feet were stretched towards the temple's deity. When some Hindus found fault with her, she asked them to place her feet where God was not present. But whichever side they turned her feet God was surely there.

Idol worship is only one form of worshipping. But if God resides in one's heart, it hardly matters where one's feet may be. Man can worship with his feet, and he can also kick with them. If there is a fire raging like a volcano it cannot be extinguished with water. If I control it with stones and standing on it save the lives of millions of people I will certainly have worshipped God with the stones and my feet. One can worship with one's feet and hands and also with one's tongue. Worship should be sincere, no matter what method one adopts.

That is why, if that gentleman is present here, I would like to request him to allow us to carry on the prayer in peace.

I would like to emphasize that I am not at all angry with those young men. How could I be angry with them? The *Gita* does not preach anger. And right from my South Africa days I have been reciting the *Gita* verses in the course of my prayers. I have learnt this teaching of the *Gita* right from there and have carried it here with me. Those who oppose it do not know what Hinduism is. Not realizing it they indulge in devilish acts and forget God.

After this the people were quiet and the prayer was held in peace. Gandhiji said :

I am extremely grateful to God that today on the fourth day He allowed us to have our prayer in peace. Let me also tell you that nobody should think that no prayers were held during these days. When you came here, I came here and we all sat in silence, it was as good as praying, because there was prayer in our hearts.

Then, I am also indebted to those who tried to disturb our prayers. I am grateful to them because I had an opportunity to look into my heart. I had no opportunity before to examine my heart about the question of prayer. I had to search within to find out where I stood. Was there anger in my heart against them? Did my prayer mean something different? God wants to

Dhaka University Institutional Repository

test His devotees in ever so many ways, and ultimately, He frees His devotee from his trouble as you have just heard in the *bhajan*[1]. From this we must learn that whatever we suffer is ordained by God. It is God's grace that I have passed this test today.

I am also grateful to the gentleman who was persuaded by the pundit's appeal.

God has saved me from a more difficult test. Once the prayer was started, even if as few as four persons had asked me to stop, I would have said: 'You may cut my throat if you want, but I shall keep on repeating *Rama Rahim, Rama Rahim,*' and even at that moment, instead of allowing myself to be overpowered by anger, I would have prayed to God to grant them good sense as was said in the *Ramdhun.*

Let me narrate to you one thing that happened at Noakhali. It was with great difficulty that *Ramdhun* could be started there. Every time I started my journey we used to sing *Ramdhun* and as we approached some village we entered it with *Ramdhun.* We used to explain to the people that Rama, Rahim, Khuda, Ishwar were all names of God. In fact, God is known by millions of names.

If I explain to you the meaning of *Auz-o-Billahi* you would not even know that it has been taken from Arabic. Would it then be a crime if I pray in Arabic? Please do not reduce Hinduism to a worthless faith by such acts. Hinduism is a great religion. It is an ancient religion. Lokamanya Tilak[2] has proved it to be ten thousand years old. But in my view it is older than a hundred thousand years. It is eternal. What is contained in the Vedas is the essence of dharma and dharma has come into being with the functioning of human beings. That is why the Vedas are said to be without a beginning. When men realized those things they inscribed them in their hearts. They were reduced to writing much later, because man learnt the art of writing afterwards. Many of the writings too are lost. Thus a large part of the Bible too is lost from memory. The same is the case with the Koran. Many scholars of the Bible are of the opinion that it has a number of interpolations. Thus, the Shastras are endless. The essence of the Shastras, i. e., the Vedas, is that God is, and He is One. The essence of the Koran and the Bible is the same. No one may say that the Bible mentions three Gods. It mentions only one God.

I frequently visit the Viceroy. I am spending quite some time there. But that time is not wasted. I do there what I would do in Bihar, the Punjab, Noakhali and all the other places. For me the smallest work is as important as the biggest. For me whatever is in the atoms and molecules is in the universe. I believe in the saying that what is in the microcosm of one's self is reflected in the macrocosm.[1] If I leave out the Punjab, Bihar or Noakhali, I can do no work for India. For me India lives only in such places.

Today I have explained so many things to you. I feel happy about it. I thank you for maintaining peace.

[From Hindi]

Prarthana-Pravachan—Part I, pp. 19-24

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

SPEECH TO MUSLIMS[1]

NEW DELHI,
September 18, 1947

Addressing them Gandhiji said that they had to be brave and declare firmly that they would not leave their homes whatever might happen. They should look to none but God for their safety and protection. He was there to do whatever he could. He had pledged himself to do or die in Noakhali, Bihar, Calcutta and now in Delhi. He would not ask those who had left their homes to come back till there was real peace and the Hindus, the Sikhs and the Muslims agreed to live as brothers without the help of the police and the military.

He was the friend and servant of the Muslims as of the Hindus and others. He would not rest till every Muslim in the Union, who wished to live as a loyal citizen of the Union, was back in his home living in peace and security and the Hindus and the Sikhs returned likewise to their homes. He had served the Muslims for a long time in South Africa and in India. He could never forget the unity of the Khilafat days. It did not last, but it demonstrated the possibilities of lasting friendship between the Hindus and the Muslims. That was what he lived for and worked for. He was on his way to the Punjab to see that all the Hindus and the Sikhs who had been turned out of Pakistan should be able to return to their homes and live there in safety and honour. But on his way he was held up at Delhi and he would not leave it till real peace returned to the capital. Even if he was the only one to say it, he would never advise the Muslims to leave their homes. If they lived as law-abiding, honest and loyal citizens of India, no one could touch them. He was not the Government, but he had influence with those in the Government. He had had long talks with them. They did not believe that in India the Muslims had no place or that if the Muslims wished to stay here they had to do so as slaves of the Hindus. Some people had said that Sardar Patel encouraged the idea of Muslims going away to Pakistan. The Sardar was indignant at the suggestion. But he told him (Gandhiji) that he had reasons to suspect that the vast majority of the Muslims in India were not loyal to India. For such people it was better to go to Pakistan. But the Sardar did not let his suspicion colour his actions. Gandhiji was convinced that for the Muslims who wished to be citizens of the Indian Union, loyalty to the Union must come before everything else and they should be prepared to fight against the whole world for their country. Those who wished to go to Pakistan were free to do so. Only he did not wish a single Muslim to leave the Union out of fear of the Hindus or the Sikhs. Muslims in Delhi had assured him by their written declaration that they were loyal citizens of the Union. He would believe their word as he wished others to believe his. As such it was the duty of the Government to protect them. He for one would not like to live if he could not achieve that. The wrong had to be undone wherever it was. Abducted women had to be returned, forcible conversions considered null and void. The Hindus and Sikhs of Pakistan and the Muslims of East Punjab had to be reinstalled in their own homes. In Pakistan and the Union they should produce conditions that not even a little girl, whatever her religion, should feel insecure. He was glad to have read the statement of Khaliquzzaman Saheb and of the Muslims of Muzaffarnagar. But before he proceeded to Pakistan he had to help to quench the fire in Delhi. If India and Pakistan were to be perpetual enemies and go to war against each other, it would ruin both the dominions and their hard-won freedom would be soon lost. He did not wish to live to see that day.

Dhaka University Institutional Repository

They wanted independence. They were ready to sacrifice their all for the Congress, the organization which had done so much for India. Were they going to undo all that the Congress had done for more than the last 60 years? He had told them they should return blow for blow if they were not brave enough to follow the path of non-violence. But there was a moral code for the use of violence also. Otherwise, the very flames of violence would consume those who lighted them. He did not care if they were all destroyed. But he could not countenance the destruction of India's freedom.

The reports of the happenings in Bihar were awful if true. Pandit Jawaharlal had told the guilty parties that the Central Government would never tolerate such barbarism. They would even use aerial bombing to put it down. But that was the way of the British. The Congress was an organization of the people. Was the Congress to use the foreign mode of destruction against the people whose representative it was? By suppressing the riots with the aid of the military, they would be suppressing India's freedom. And yet what was Panditji to do if the Congress had lost control over the people? The better way, of course, was to give up the reins of Government, if the people were not amenable to discipline and reason.

To retaliate against the relatives or the co-religionists of the wrong-doer was a cowardly act. If they indulged in such acts, they should say good-bye to independence.

Harijan, 17-11-1946

SPEECH AT KUSHTIA

November 6, 1946

Addressing the waiting crowd Gandhiji said that his object in going to Noakhali was not to take sides and promote mutual quarrelling. He had toured all over Bengal including East Bengal with the late Ali Brothers. Those were the days when they had Hindu-Muslim unity. Large numbers of Muslims joined the Congress. The Congress then belonged to all. But today he was not going to East Bengal as a Congressman. He was going there as a servant of God. If he could wipe away the tears of outraged women, he would be more than satisfied.

Shaheed Saheb wanted to accompany him on the East Bengal tour but he was held up in Calcutta. He had sent Shamsuddin Saheb (the Labour Minister) instead. Shamsuddin Saheb had not come to spy upon him but to ensure Government help wherever it was required. He was hopeful that the tour would have good effect and the Hindu-Muslim unity of the Khilafat movement would come back. In the Khilafat days, no one talked of dividing India. Now they did so. But partitioning, even if it was desirable, could not be achieved through violence. Even if it could be achieved, it could not be retained except by the goodwill of the people concerned. The Bengal Ministers had assured him yesterday that the Muslims did not believe in Pakistan through force.

Continuing, Gandhiji said that perhaps his place now was in Bihar. He had served Bihar much more and he had much greater influence on the people there than in Bengal. For the time being, instead of proceeding to Bihar, he was satisfied by addressing an open letter[1] to the Biharis which they would all see and all that he had to say to the audience was that they could not live in India as enemies. They had to be friends and brothers. All that had happened in Bengal and was happening in Bihar was most unbecoming. They were being disgraced before the whole world. He had to go to Noakhali and would stay on till Hindus and Muslims again lived as blood-brothers.

The Bombay Chronicle, 7-11-1946

Dhaka University Institutional Repository

SODEPUR,
November 6, 1946

TO BIHAR,

Bihar of my dreams seems to have falsified them. I am not relying upon reports that might be prejudiced or exaggerated. The continued presence of the Central Chief Minister and his colleagues furnishes an eloquent tale of the tragedy of Bihar. It is easy enough to retort that things under the Muslim League Government in Bengal were no better, if not worse and that Bihar is merely a result of the latter. A bad act of one party is no justification for a similar act by the opposing party, more especially when it is rightly proud of its longest and largest political record. I must confess, too, that although I have been in Calcutta for over a week I do not yet know the magnitude of the Bengal tragedy. Though Bihar calls me, I must not interrupt my programme for Noakhali. And is counter-communalism any answer to the communalism of which Congressmen have accused the Muslim League? Is it Nationalism to seek barbarously to crush the fourteen per cent of the Muslims in Bihar?

I do not need to be told that I must not condemn the whole of Bihar for the sake of the sins of a few thousand Biharis. Does not Bihar take credit for one Brajkishore Prasad or one Rajendra Prasad? I am afraid, if the misconduct in Bihar continues, all the Hindus of India will be condemned by the world. That is its way, and it is not a bad way either. The misdeeds of Bihari Hindus may justify Qaid-e-Azam Jinnah's taunt that the Congress is a Hindu organization in spite of its boast that it has in its ranks a few Sikhs, Muslims, Christians, Parsis and others. Bihari Hindus are in honour bound to regard the minority Muslims as their brethren requiring protection, equal with the vast majority of Hindus. Let not Bihar, which has done so much to raise the prestige of the Congress, be the first to dig its grave.

I am in no way ashamed of my ahimsa. I have come to Bengal to see how far in the nick of time my ahimsa is able to express itself in me. But I do not want in this letter to talk of ahimsa to you. I do want, however, to tell you that what you are reported to have done will never count as an act of bravery. For thousands to do to death a few hundreds is no bravery. It is worse than cowardice. It is unworthy of nationalism, of any religion. If you had given a blow against a blow, no one would have dared to point a finger against you. What you have done is to degrade yourselves and drag down India.

You should say to Pandit Jawaharlalji, Nishtar Saheb and Dr. Rajendra Prasad to take away their military and themselves and attend to the affairs of India. This they can only do if you repent of your inhumanity and assure them that Muslims are as much your care as your own brothers and sisters.

You should not rest till every Muslim refugee has come back to his home which you should undertake to rebuild and ask your Ministers to help you to do so. You do not know what critics have said to me about your Ministers.

Dhaka University Institutional Repository

Concluding, Gandhiji further advised them that, as a token of their loyalty to the Indian Union, they should issue a public statement that all Hindu women abducted by the Muslims in Pakistan should be restored to their families. They should unequivocally condemn the Pakistan Government where it had departed from the civilized conduct and demand that all those Hindus and Sikhs who had to leave their homes in Pakistan should be invited to return with full guarantee of their safety and self-respect.[1]

Harijan, 28-9-1947

SPEECH AT PRAYER MEETING[1]

DATTAPARA,
November 12, 1946

Gandhiji again referred to the question of repatriation. The Moulvi Saheb, the Vice-President of Union No. 6, who had addressed them before him had invited them in the name of the Mussalmans to return to their homes. But it was not so easy in action as it was in speech. Everyone was anxious to see the two communities live in peace and harmony once again. For that it was not necessary that they should have the same religion. He had seen awful sights of destruction. He had seen the terror-stricken faces of the sufferers. They had been forcibly converted once and they were afraid the same thing would be repeated. He wanted them to shed that fear. He alone deserved to live who refused to give up God's name.[2] He remembered how during the Jallianwala Bagh days, young English lads made big, hefty men crawl on their bellies. The lane through which they were made to crawl was called the crawling lane. Those men had a human form but they were worse than worms. So they must learn to be brave and face death rather than give up Ramanama.

He was not enamoured of the military and the police. The function of the police was to arrest thieves and dacoits, that of the military to guard them against foreign aggression. The police and the military could not teach them to cease fighting among themselves and live as friends. He would not ask anyone to return to their homes unless one good Hindu and one good Muslim stood surety for their safety in their respective villages.[3] He referred to the scheme for repatriation but it could work only if the Muslim League wished to have peace and fully co-operated. Shamsuddin Saheb was coming in two or three days. They would hear from him what the League Government wanted to do.

Harijan, 1-12-1946; and *Hindustan Standard*, 15-11-1946

SPEECH AT PRAYER MEETING[1]

SODEPUR, CALCUTTA,
November 5, 1946

The Hindus, said Gandhiji, might say: did not the Muslims start the troubles? He wanted them not to succumb to the temptation for retort but to think of their own duty and say firmly that whatever happened they would not fight. He wanted to tell them that the Muslims who were with him in the course of the day had assured him that they wanted peace. They were all responsible men. They said clearly that Pakistan could not be achieved by fighting. If they continued quarrelling with each other, independence would vanish into thin air and that would firmly implant the third power in India, be it the British or any other. India was a vast country, rich in minerals, metals and spices. There was nothing in the world that India did not produce. If they kept on quarrelling, any of the big powers of the world would feel tempted to come and save India from Indians and at the same time exploit her rich resources.

Dhaka University Institutional Repository

I regard myself as a part of you. Your affection has compelled that loyalty in me. And since I claim to have better appreciation than you seem to have shown of what Bihari Hindus should do, I cannot rest till I have done some measure of penance. Predominantly for reasons of health, I had put myself on the lowest diet possible soon after my reaching Calcutta. That diet now continues as a penance after the knowledge of the Bihar tragedy. The low diet will become a fast unto death, if the erring Biharis have not turned over a new leaf.

There is no danger of Bihar mistaking my act for anything other than pure penance as a matter of sacred duty.

No friend should run to me for assistance or to show sympathy. I am surrounded by loving friends. It would be wholly wrong and irrelevant for any other person to copy me. No sympathetic fast or semi-fast is called for. Such action can only do harm. What my penance should do is to quicken the conscience of those who know me and believe in my *bona fides*. Let no one be anxious for me, I am like all of us in God's keeping.

Nothing will happen to me so long as He wants service through the present tabernacle.

Your servant,
M. K. GANDHI

Harijan, 10-11-1946

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

* আলোচ্য পরিশিষ্ট অংশে সমস্ত পত্র, ভাষণ, প্রবন্ধ ও স্বাক্ষাৎকার
The Collected Works of Mahatma Gandhi
The Publication Division
Ministry of Information and Broadcasting,
Government of India, 1974. থেকে সংগৃহীত।

এস. এ. বেরিলভি-কে লেখা মহাত্মা গান্ধীর পত্র

New Delhi
Sep 18, 1947

Bhai Brelvi,

I have your telegram, This is the complete English report. There is no time to write more. It is difficult to say what will ultimately happen in Delhi. If the Pakistan Government can bring about some improvement, the people here can return to sanity. For my part I am pledged to do or die.

Blessings you
Bapu

from a copy of the Hindi: Pyrelal papers

জওহর লাল নেহেরুকে পাঠানো মহাত্মা গান্ধীর তারবার্তা

NOVEMBER 3, 1946

"MORNING NEWS" REPORTS BUTCHERY BY HINDUS OF MUSLIM PASSENGERS. MUSLIMS FLEEING FROM MOB FURY AND PREMIER COUNTENANCING. WIRE PARTICULARS.

The Bombay Chronicle, 5-11-1946.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

LETTER TO VALLABHBHAI PATEL

BIRLA HOUSE, NEW DELHI,
November 1, 1947

CHI. VALLABHBHAI,

When you came to see me yesterday, I simply forgot that it was your birthday.[1] I could not, therefore, give you my blessings personally. Such is my plight today.

I write this for special reasons:

1. Refugees are crowding near the Birla Mandir. It is not possible for all of them to live there and they huddle together somehow. They must be removed to a camp and that too quickly.

2. I enclose a letter regarding mosques. It is only one of many such. A statement should be issued that all of them will be protected from abuse and whatever damage they might have suffered will be repaired by the Government.

3. It should be announced that those who were forcibly converted to Hinduism or Sikhism will be regarded by the Government as not having changed their religion and will receive adequate protection.

4. No Muslim will be forced to leave the Union.

5. Those who have been compelled to vacate their houses or whose houses have been illegally occupied by others, should be assured that such occupation will be regarded as null and void and that the houses will be reserved for the original owners.

I think it is necessary to issue such a statement.[2]

Blessings from
BAPU

[From Gujarati]

Bapuna Patro–2 : Sardar Vallabhbhaine, pp. 376-7

জওহরলাল নেহেরুকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর পত্র

Yeravda Central Prison, Poona
May 2, 1933

MY DEAR JAWAHARLAL,

As I was struggling against the coming fast, you were before me as it were in flesh and blood. But it was no use. How I wish I could feel that you had understood the absolute necessity of it. The Harijan movement is too big for mere intellectual effort. There is nothing so bad in all the world. And yet, I cannot leave religion and, therefore, Hinduism. My life would be a burden to me if Hinduism failed me. I love Christianity, Islam and many other faiths through Hinduism. Take it away and nothing remains for me. But then, I cannot tolerate it with untouchability—the high and low belief. Fortunately, Hinduism contains a sovereign remedy for the evil. I have applied the remedy. I want you to feel, if you can, that it is well if I survive the fast and well also if the body dissolves in spite of the effort to live. What is it after all—more perishable than a brittle chimney piece. You can preserve the latter intact for ten thousand years, but you may fail to keep the body intact even for a minute. And surely, death is not an end to all effort. Rightly faced, it may be but the beginning of a nobler effort. But I won't convince you by argument, if you did not see the truth intuitively. I know that even if I do not carry your approval with me, I shall retain your precious love during all those days of ordeal. . .

Love from us all,
BAPU

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

LETTER TO VALLABHBHAI PATEL

CALCUTTA,
September 1, 1947

CHI. VALLABHBHAI,

I got your letter. Bhopal (Nawab's) letter is strange.[1] I did not like it. Your task is hard indeed. May God grant you the necessary strength. If Bhopal plays the game, Hyderabad's problem will be easy to solve. And the same will be true of Pakistan.

I have already sent you my programme, but now even that is as good as cancelled. We were to go to Noakhali tomorrow morning. So Shaheed Saheb went home. I am the only elderly person in the house. Dinshaw Mehta is here, but what can he do? He does not know the language and his large body is of no use.

Someone received knife wounds in Machhva Bazaar. No one knew who stabbed him. People brought him here for demonstration. Perhaps they wanted to attack Shaheed Suhrawardy, but they could not find him; so their anger was turned on me. There was an uproar in the front yard. Both the girls[2] went out among the crowd. I was in bed about to go to sleep. Our Muslim landlady came in to have a look as she was afraid I might come to harm. I sensed danger and got up. I broke my silence. My vow permits me to break it on such occasions. I went to face the crowd but the girls would not leave my side. Other people also surrounded me. Glass windows were being broken and they started smashing the doors also. There was an attempt to cut the wires of the electric ceiling fans but only a few were snapped. I started shouting at the crowd, asking them to be quiet. But who would listen? I could, moreover, speak only Hindustani and they were Bengalis. There were also some Muslims nearby. I asked them not to strike back. So they merely stood around me. There were two groups; one trying to incite the crowd, the other trying to pacify it. There were two policemen also. They also used no force. With folded hands they addressed [the crowd] in a loud voice and they stopped me. Kalyanam suggested that I should go and sit inside. Bisen was in the centre. He was wearing only pyjamas and was taken for a Muslim. Bricks were thrown. One hit a Muslim. No one was wounded, but the brick could have struck me. The Superintendent of Police came soon after and the youngsters dispersed after causing considerable damage to the house. Prafulla Babu[1] and Annada[2] arrived. Prafulla suggested the posting of more police guard but I objected. Everyone suspects the Hindu Mahasabha [was behind the attack]. I have asked them to see Syamaprasad[3] and Chatterji[4] before arresting the mischief-makers and not to do anything in a hurry. Such is the position here. I could thus go to bed only at 12.30 a. m. Of course I had to get up at the usual hour.

Please tell Jawaharlal about this when you meet him.

Read the accompanying wire. I feel totally lost. I pin my hopes on you two. The copy of my reply is on the reverse.

In this situation you may take it that I am here. "As for tomorrow, who can tell?"

Blessings from
BAPU

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪ LETTER TO SATIS CHANDRA MUKERJI

February 1, 1947

DEAR SATISBABU[1],

Your lovely letter.[2] I endorse all your propositions though probably I would put them differently and comprise them into one. But that does not diminish the value of the propositions. Alas I am far as yet from that state! At the same time, I am hastening towards it. If I attain that state or even come near enough to it (and probably that is all that a human being can reach), this problem of Noakhali will be easily solved. Let us see what happens.

Please do not hesitate to write to me or dictate a letter for me whenever you feel like telling me something. Know that your messages will never be a strain on me.

And now I put before you a poser. A young girl (19) who is in the place of granddaughter to me by relation shares the same bed with me, not for any animal satisfaction but for (to me) valid moral reasons. She claims to be free from the passion that a girl of her age generally has and I claim to be a practised *brahmachari*. Do you see anything bad or unjustifiable in this juxtaposition? I ask the question because some of my intimate associates hold it to be wholly unjustifiable and even a breach of *brahmacharya*. I hold a totally opposite view. As you are an experienced man and as I have regard for your opinion, I put the question. You may take your own time to answer the question. You are in no way bound to answer it if you don't wish to.

Hope you are well.

Yours,
BAPU

From the original: C. W. 10557

LETTER TO JAYAPRAKASH NARAYAN

DATTAPARA,
November 12, 1946

CHI. JAYAPRAKASH,

I feel that today you are the God in Bihar. Will Bihar really become calm? We have committed a grievous error. Write to me frankly what is likely to happen now. Give me your unreserved opinion. I have a feeling that there should be no Congress [session] this time. Leaders of all the provinces should remain in their own provinces. You may convey my opinion to all. I may not be able to do it as I have little free time.

Where is Prabha[1]? What does she do?

I hope you are keeping well.

Blessings from
BAPU

SHRI JAYAPRAKASH NARAYAN
PATNA

From a copy of the Hindi : Pyarelal Papers. Courtesy : Pyarelal

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫ *INTERVIEW TO VINCENT SHEEAN*[1]

NEW DELHI,
January 27/28, 1948

Gandhiji's objection to the use of force was not that force could as well be used to support unrighteous wars; it was fundamental.

I do not know what is intrinsically good. Hence I do not go by results. It is enough if I take care of the means.

For instance, as a nature-curist, he did not believe in the use of sulpha drugs. Suppose he got typhoid. Should he abandon his belief and try to get cured by taking sulpha drugs?

I do not know whether it is good for me or humanity to be cured by the use of sulpha drugs; so I refuse to use sulpha drugs . . .[2] If evil does seem sometimes to result from good, the inference would be that the means employed were probably wrong.

Good action to produce good results must be supported by means that are pure.

If those who believe in the idea of non-violence keep away from government, government will continue to be carried on by the use of force. How is then the transformation of the existing system of government to be brought about?

Gandhiji admitted that ordinarily government was impossible without the use of force.

I have therefore said that a man who wants to be good and do good in all circumstances must not hold power.

Is all government to come to a standstill then?

No, he (the man of non-violence) can send those to the Government who represent his will. If he goes there himself, he exposes himself to the corrupting influence of power. But my representative holds power of attorney only during my pleasure. If he falls a prey to temptation, he can be recalled. I cannot recall myself. All this requires a high degree of intelligence on the part of the electorate. There are about half a dozen constructive work organizations. I do not send the workers to the Parliament. I want them to keep the Parliament under check by educating and guiding the voters.

You mean to say that power always corrupts?

Yes.

Asked further whether this did not call for a very prolonged and high degree of discipline which it would be too much to expect of common people, he answered, "No." It was their inertia that made people think so.

Too much is being made of the study of things that are in my view really of not much consequence to humanity, to the neglect of things eternal. Take, for instance, the exact distance of the sun from the earth or the question whether the earth is round. The discipline that is necessary to discover the laws that govern life is no less important and yet we say that it is so laborious that only a select few can attain it. For instance, we steal in so many ways—not to steal in any shape or form needs some mental poise, contemplation. I have given my time not to abstract studies but to the practice of things that matter.

Dhaka University Institutional Repository

To Sheean's question whether misuse of atomic energy might not endanger our planet itself since the phenomenal universe is perishable, Gandhiji answered that everything was possible "including the dissolution of appearances . . .[1] and the survivors, if any, will then say, 'what a wondrous spectacle' ". He very much doubted that the advent of the atomic era would basically affect human problems.

They claim that one atom bomb changed the entire course of the war and brought the end of war so much the nearer. And yet it is so far. Has it conquered the Japanese spirit? It has not and it cannot. Has it crushed Germany as a nation? It has not and it cannot. To do that would require resorting to Hitler's method, and to what purpose? In the end it will be Hitlerism that will have triumphed.

The whole of the *Gita* was an argument in defence of a righteous war, Gandhiji's visitor argued. The last war was a "war in a righteous cause". Yet violence was more rampant as a result than it was ever before. Gandhiji agreed so far as the result of the last war was concerned. Even in India they had not been able to escape from its back-lash.

See what India is doing.. See what is happening in Kashmir. I cannot deny that it is with my tacit consent. They would not lend ear to my counsel. Yet, if they were sick of it, I could today point them a way. Again, see the exhibition that the United Nations Organization is making. Yet I have faith. If I live long enough . . .[1] they will see the futility of it all and come round to my way.

But he did not agree that the *Gita* was either in intention or in the sum total an argument in defence of a righteous war. Though the argument of the *Gita* was presented in a setting of physical warfare, the "righteous war" referred to in it was the eternal duel between right and wrong that is going on within us. There was at least one authority that supported his interpretation. The thesis of the *Gita* was neither violence nor non-violence but the gospel of selfless action—the duty of performing right action by right means only, in a spirit of detachment, leaving the fruits of action to the care of God.

Mahatma Gandhi—The Last Phase, Vol. II, pp. 677 and 763-5

INTERVIEW TO UNITED PRESS OF INDIA

SODEPUR,
November 6, 1946

Gandhiji was asked whether he thought that after the withdrawal of the British troops from this country, the present disturbances would immediately stop and how he thought that the minority communities would be safeguarded from a fear of the majority communities in the different parts of the country. Replying Mahatma Gandhi observed:

The disturbances will not stop immediately, but they must stop much quicker when the British troops are withdrawn. To-day we have to witness the degrading spectacle of wanting the help of the British troops. When they are withdrawn, people

Dhaka University Institutional Repository

will necessarily learn the art of self-defence with counter-violence or, better still, with non-violence. The minorities will undoubtedly keep the British troops if they can unless they learn to be brave and trust the majority.

Again, when the British troops are gone, the majority will know how to behave towards the minority. Today, even the best behaviour of the majority does not receive its full value whilst the temptation of relying on British troops exists. By British troops, I do not mean merely White soldiers, but all who have been trained by British officers and have been trained to be loyal to the British in India and have often enough been used against the people to crush their freedom.

In any event people will have first to learn to do without the protection of the military or the police during communal troubles. The function of the police is to protect the citizens against thieves and robbers, of the military generally to defend the country against the foreign aggressor where the people have not learnt the matchless bravery of non-violence.

When Gandhiji's attention was drawn to the fact that in Calcutta and other places, people could move about quite safely even in the riot-affected areas if they were dressed in European fashion as the miscreants took them to be Christians, he said:

It is impossible for any self-respecting man to appreciate the advice that he must look like a Christian in order to avoid murder. The suggested change would cast a reflection on the Hindu as well as the Muslim. In order to live at peace with one another, we have to imbibe the virtue of toleration of the manners, customs and dresses of the different communities living in India.

The Hindu, 11-11-1946

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

We deeply deplore the recent acts of lawlessness and violence that have brought the utmost disgrace on the fair name of India and the greatest misery to innocent people, irrespective of who were the aggressors and who were the victims.

We denounce for all time the use of force to achieve political ends, and we call upon all the communities of India, to whatever persuasion they may belong, not only to refrain from all acts of violence and disorder; but also to avoid both in speech and writing, any words which might be construed as an incitement to such acts.

15/4/47

The joint peace appeal signed by Jinnah in English and by Gandhi in Devanagari, Urdu and English, dated Delhi, April 1947

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

AS A STUDENT IN LONDON

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

Mahatma Gandhi

Mohd. Ali Jinnah

Jawaharlal Nehru

Lord Mountbatten

পরিশিষ্ট-৭

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থ সমূহ ঃ

[বাংলা]

আজাদ, মাওলানা আবুল কালাম (আসমা চৌধুরী ও লিয়কত আলী অনূদিত)
ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, স্বপ্নিল প্রকাশনী, ঢাকাঃ ১৯৮৯ইং।

আনোয়ার, আলী
ধর্ম নিরপেক্ষতা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩ইং।

আলী, সৈয়দ মুকসেদ
রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ইং।

আলী, অধ্যাপক কে
ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্য ও আধুনিক যুগ), আলী পাবলিকেশন, ঢাকাঃ ১৯৮৭ইং

ইসলাম, কে. এম. নূরুল
স্বাধীনতার অমীমাংসীত প্রশ্ন , ঢাকাঃ আসমা ইসলাম, ১৯৯৫ইং।

ইসলাম, সৈয়দ সিরাজুল
স্নাতক রাষ্ট্র বিজ্ঞান, হাসান বুক হাউস, ঢাকাঃ ১৯৯০ইং।

উমর, বদরুদ্দীন
সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫ইং।

ওদুদ, কাজী আব্দুল
হিন্দু মুসলমানের বিরোধ, কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৪২বাংলা।

খান, মোহাম্মদ আসগর ফয়সাল
ইসলাম রাজনীতি এবং রাষ্ট্রঃ পাকিস্তান অভিজ্ঞতা, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৯২ইং।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ (অনুবাদকঃ দাশগুপ্ত, শ্রী সতীশ চন্দ্র)
আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ, গান্ধী সাহিত্য প্রকাশনী, কলিকাতাঃ ১৯৮৬ইং

গান্ধী, মোহন দাস করম চাঁদ
আমার ধ্যানের ভারত, কলিকাতাঃ ঘোষ ও মিত্র, ১৯৮৭ইং।

গুপ্ত, ভূপেশ
ছোটদের গান্ধীজী, কলিকাতাঃ কমলা বুক ডিপো, ১৩৬২বাংলা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষ, সুবোধ
অমৃত পথ যাত্রী, কলিকাতাঃ ইউনিয়ন এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, ১৩৭৯বাংলা।

চন্দ্র,বিপিন
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলিকাতাঃ কে, বি বাগচী এন্ড কোং, ১৯৯৪ইং।

চন্দ্র, বিপান
আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা বাদ, কলিকাতাঃ ১৯৮৯ইং

চট্টোপাধ্যায়, ভবানী প্রসাদ
দেশ বিভাগঃ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩ইং।

চন্দ, নারায়ণ চন্দ্র ও ভট্টাচার্য সুনীল
ইতিহাসের হাজারো ঘটনা, কলিকাতাঃ মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৪ইং।

তোফায়েল
বাংলাদেশে মহাত্মা গান্ধী, ঢাকাঃ পাঁচগাঁও প্রকাশনী, ১৩৯৯বাংলা।

দত্ত, অম্লান
গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৩ বাংলা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার
দাঙ্গার ইতিহাস, কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪০১ বাংলা।

বসু , প্রভাত
বিশ্ব মানবতাবাদ ও গান্ধীবাদ, কলিকাতাঃ কমলা ওয়াজি পাবলিশার্স, ১৩৫৬ বাংলা।

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ
দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকাঃ রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৭ইং।

ভৌমিক, নিম চন্দ্র
সাম্প্রদায়িকতা এবং বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ১৯৯৫ইং

মুখপাধ্যায়, গীতা
একই বৃন্তে দু'টি ফুল, কলিকাতাঃ আলফা বিটা পাবলিশার্স, ১৯৭৭ইং।

রায়, সুকুমার
নোয়াখালী ও মহাত্মা গান্ধী, কলিকাতাঃ ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ১৯৯৬ইং।

রাহা, সুব্রত
অস্পৃশ্যতার রাজনীতি, কলিকাতাঃ মর্ডান কলাম, ১৯৮৭ইং।

Dhaka University Institutional Repository

রোঁমা রোঁলা (অনুবাদ, ঋষি দাস)
মহাত্মা গান্ধী, ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৪৮।

লাহিড়ী, প্রফুল্ল চন্দ্র
গান্ধীজীর জীবনী হইতে কয়েকটি ঘটনা, কলিকাতাঃ এম মুখার্জি এন্ড কোং, ১৩৫৮ বাংলা।

সেন, সুজিত কুমার
সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও উত্তোরণ, কলিকাতাঃ পুস্তক বিপনী, ১৯৯৯ইং

হালিম, মোঃ আব্দুল
সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতিঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, ঢাকাঃ মোঃ ইউসুফ আলী খান, ১৯৯৫ইং

হোসেন, লতা
প্রসঙ্গঃ সাম্প্রদায়িকতা, ঢাকাঃ সানন্দ প্রকাশন, ১৯৯৩ইং।

হোসেইন, তোফাজ্জল
স্মৃতি কণা, ঢাকাঃ বদরুননেসা হোসেন, ১৯৭৮ইং

[English]

Ahuja, M.L.
Glipses of some Great Indians, New Delhi: Vikas Publishers, 1997

Andrews, C.F.
Mahatma Gandhi his idea , London: George Allea & Unwin Ltd.,1949

Ashe, Geoffrey
Gandhi: A Study in Revolution, London: Helumann, 1968

Azad, Maowlana A.K.
India Wins Freedom, New Delhi: Orient Longmans Ltd. 1884

Adiraju, Venkateswer Rao
Gandhi to Gandhi (Family), New Delhi: Sathya Publishers. 1986

Bose, Anima
Mahatma Gandhi: A contemporary Perspective,
New Delhi: B.R. Publishers. 1977 .

Birla, G.D.
In the Shadow of the Mahatma: (A personal Memory)
Bombay: Orient Longmans Ltd. 1953

Dhaka University Institutional Repository

Bhave, Y.G.
The Mahatma and Muslims, New Delhi: Northern Book Center, 1997

Bose ,Subhas Chandra
The Indian Struggle (1920-1942), Asia Publishing House, Calcutta, 1964.

Chadha, Yogesh
Rediscovering Gandhi, London: Century Books Ltd. 1997.

Diwakar, R.R.
Is not Gandhi The Answer, Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1966 .

Eaton, Jeahette
*Gandhi: Fighter without Sword,*New York: Willam Marrow & Co. 1950

Fischer Louis
The life of Mahatma Gandhi, Harper & Brothers Publishers, NewYork, 1950

Gandhi, Mahatma
All Men are Brothers, Unesco: Orient Longmens, 1958

Gandhi, Manuben
Last Glimpses of Bapu, New Dellhi: Shivalal Agarwala & Co. 1962

Gupta, Manmathnath
Gandhi and his times, New Delhi: Lipi Prokasan, 1982

Gandhi, Rajmohan
The grad boat man: A Portrait of Gandhi,
New Delhi: Viking Penguin Books. 1995

Ghose, Sarker
Mahatma Gandhi, New Delhi: Allied Publishers. 1991 .

Habib, Irfan
Addressing Gandhi, New Delhi: Shmt, 1995.

Iyer, Raghavan N.
The moral and political thought of M. Gandhi,
New Delhi: Oxford University Press. 1973 .

Iyengar, A.S.
All Through the Gandhi Era, Bombay: Vinad Kitabas Ltd., 1950

Dhaka University Institutional Repository

Japheth, M.D.
Mahatma Gandhi: (A Story of our time and for all times)
Bombay: Pearl Publishers, 1986

Jack, Homer. Ed.
The Gandhi Reader: A source book of life and writings,
Madras: Samata Books. 1983.

Jha, D.C.
Mahatma Gandhi: The congress and the Partition of India,
New Delhi: Sanchar Publishers, 1995

Joshi Uma Sankar
Stories from Bapus Life, New Delhi: NBI, 1991

Keer, Dhananjay
Mahatma Gandhi: Political Saint and Unarmed Prophet,
Bombay: Popular Prakashan. 1973.

Krishna, Kripaline
Gandhi: A Life, New Delhi: NBT, 1986.

Kripalani, J.B.
Gandhi: His Life & Thoughts, New Delhi: MIB, 1971.

Kripalani, Krishana
Gandhi: A Life Revisited, New Delhi: Inter Print, 1994 .

Kotari Rajani
Politics in India, Orient Longmen Ltd, New Delhi, 1970

Lapirre Dominique and Larry Collins
Freedom at Midnight, Vikas Publishing House Pvt. Ltd. Delhi, 1997

Mahajan, Sucheta
Independence and Partition, Sage Publication, New Delhi, 2000.

Mc Donough, Sheila
Gandhi's Responses to Islam, New Delhi: D.K. Print World, 1994.

Mukerjee, Hiren
Ghandiji: A Study, Calcutta: National Book Agency, 1958

Nanda, B.R.
Gandhi and his Critics, New Delhi: Oxford University press. 1995.

Dhaka University Institutional Repository

Nanda, B.R
Gandhi: A Pictorial Biography, New Delhi: MIB, 1972 .

Nanda, B.R. (Ed.).
Gandhi 125 Years, New Delhi: ICCR, 1994.

Narayan Shirman
Mahatma Gandhi: The Atomic Man, Somaiya Publication, 1971

Nehru, Jawaharlal
Mahatma Gandhi, Calcutta: Signet Press, 1949.

Nehru, Jawaharlal
The Discovery of India, Anchor Books Edition, Delhi.

Narayan, Sriman
Gandhi: The mjan and his throught, New Delhi: MIB, 1969

Prasad, Rajendra
Legacy of Gandhiji, Agra: Agarwala & Co. 1962.

Patil, V.T. Ed.
Studies on Gandhi, New Delhi: Sterling Publishers. 1983

Payen Robert
The Life and Deth of Mahatma Gandhi,
New York: Smitmmark Publishers, 1994.

Prasad, Bimal
Gandhi, Nehru & J.P.: Studies in Leadership,
New Delhi: Chankya Publishers. 1985

Pattabhi, B & Sitaramayya
Gandhi & Gandhism Vol.-I, Kitabistan, Delhi: 1943

Putter, Benjamin
What Gandhi means to Me, New Delhi: New Book Society. 1996 .

Rolland, Romain
Mahatma Gandhi: (The man who become one with the universal being)
New Delhi: MIBGI, 1969

Radhakrishnan Ed.
Mahatma Gandhi 100 Years, New Delhi: Gandhi Peace Foundation. 1994 .

Reddy, E.S.
Gandhiji: Vision of Free South Africa, New Delhi: Sancher Publishers. 1995

Dhaka University Institutional Repository

Rao, U.R.
Let Us Know Gandhiji, New Delhi: MIB, 1969.

Sawant, S.D.
Gandhi Ston, New Delhi: MIGB, 1966

Sen N.B. Ed.
Wait and Wisdom of Mahatma Gandhi,
New Delhi: New Book Society of India. 1995

Sethi, J.D.
Gandhi Today, New Delhi: B.R. Publication. 1994.

Shankar, Dayal Singh
Gandhi's First Step: Champaran Movement,
New Delhi: B.R. Publication. 1994.

Sharp, Gene
Gandhi Wields the Weapon of moral power,
Ahmedabad: Navajivan Publications. 1960.

Sarma. D.S.
The Father of Nation: (The life and Teaching of Mahatma Gandhi),
Madras: B.G. Paul & Co. 1956

Saiyidain, K.G.
Significance of Gandhi: As a man and thinker, New Delhi: MIB, 1970

Shahani, Ranjee
Mr. Gandhi, New York: The Macmillan Co. 1961.

Sheean, Vincent
Mahatma Gandhi: A general life in brief,
New Delhi: Ministry of information and Broadcasting, 1969.

Shulka, Chandra Shanker
Incidents of Gandhiji's Life, Bombay: Vora & Co. 1949.

Sinha, Sachchidanand
The Unarmed Prophet, Muzaffarpur: Moral Prakshan, 1988 .

Tendulker D.G.
Mahatma :The life and Teaching of Mahatma Gandhi,(Vol. 1-30)
Publication division, Ministry of information and Broadcasting,
Government of India, Delhi, 1952

Dhaka University Institutional Repository

Thomson, Mark
Gandhi and his Ashrams, Bombay: Popular Parakashan, 1993.

The Publication Divison,
Ministry o Information and Broadcasting Government of India, 1974
Collected works of Mahatma Gandhi,Vol.-62-90

নির্বাচিত পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী ঃ

[বাংলা]

চৌধুরী, নাজমা জেসমিন
'বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি', পি,এইচ,ডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চট্টোপাধ্যায়, ভোলা
এক সত্যকার সত্যাগ্রহী', *সাপ্তাহিক দেশ*, ৫৭বর্ষ, ৪৪সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ইং।

মোহাম্মদ, ইসমাইল
সত্যের সৈনিক, ১১৪তম মহাত্মা গান্ধী জন্ম জয়ন্তী, ঢাকাঃ ১৯৮৩ইং

শামসুদ্দীন, আবু জাফর
মানবতাবাদঃ মহাত্মা গান্ধী, ১১৪তম মহাত্মা গান্ধী জন্ম জয়ন্তী, ঢাকাঃ ১৯৮৩ইং

করিম, রশিদ
একলা চলরে, দৈনিক বাংলার বাণী, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৯২ইং।

[English]

Beli, Cristofer
The Pre-History of Communalism/ Religious Conflict, Modern Asian Studies, April, 1985.

The Statesman, *The local Bully Again Flourishes*, 3 June, 1954.
Indian Annual Register 1939, 22nd part.

Parida, Pradeep Kumar
Understanding the cause of communalism in Post - Independence India: Severity and challenges for future, Man and Development, Vol. XXIV No. 2 Delhi, India, 2002

Mathur, J.S
Gandhi: A Sublime Failur, Gandhi Prasang, Vol.-V, Allahabad, India, 2002

Daga, Mahesh
The making of a riot narrative, Seminar November, 2000, 519, Delhi.

Guha, Amatendu
Concept of Philosophy of Peace, Gandhi Prasang, Vol.-V, Allahabad, India, 2002